মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

আবদুন নূর

ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের দু'দশক পর 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'কে ঘিরে দেশে নতুন করে বিতর্কের সূচনা করা হয়েছে। এই বিতর্কে যাঁরা জড়িয়ে পড়েছেন তাঁদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা যেমন আছেন, তেমনি মুক্তিযুদ্ধে কোনভাবেই অংশ গ্রহণ করেননি এমন ব্যক্তিবর্গও রয়েছেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, এই উভয় দলের বক্তব্যের মধ্যে মিলের চাইতে গরমিলই যেন পরিলক্ষিত হচ্ছে বেশী। এতে জাতীয় জীবনে সৃষ্টি হচ্ছে বিভ্রান্তি, হতাশা, উৎপাদনহীনতা ও নৈরাজ্য।

স্বাধীনতা উত্তর '৭২ এর সংবিধান প্রণয়নকালে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র দোহাই দিয়ে 'সমাজতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে যাঁরা রাষ্ট্রীয় মৌলনীতি হিসাবে শাসনতন্ত্রে জুড়ে দিয়েছিলেন, তাঁরাই আবার বিরানব্বইয়ে এসে দলীয় মেনিফেস্টো থেকে 'সমাজতন্ত্র'কে বিসর্জিত করেছেন। অপরদিকে, একাত্তরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মহান নায়ক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শাসনতন্ত্রে আনীত এক সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার পরিচালনার মৌলনীতি হিসাবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে বাদ দিয়ে তদ্‌স্থলে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীর ধর্মীয় মূল্যবোধকে সংযোজিত করেছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে, "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা" আসলে কি? তাই আজ সবচাইতে বেশী প্রয়োজন এ ব্যাপারে জাতীয় ঐক্যমত সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে সবারই সমবেত প্রচেষ্টা গ্রহণের। কিন্তু স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বলে আত্মপরিচয়দানকারী এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও তাদের সহায়ক রাজনৈতিক শক্তি 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র নামে স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ বিতর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে জাতিকে বিভাজন এবং দেশব্যাপী উত্তেজনা সৃষ্টির মাধ্যমে আর একটি মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের ডাক দিয়েছেন। কিন্তু আসল সত্য যাই হউক না কেন, এ জাতীয় বিতর্কের অশুভ প্রভাব পড়ছে জাতীয় সংহতি ও সম্প্রীতি সম্পর্কে এবং বিশেষতঃ শিক্ষার পরিবেশ ও উৎপাদন ব্যবস্থার উপর। এভাবে জাতীয় উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা মোটকথা, বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা আজ যেন আবার নতুন করে হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।

অতএব, জাতীয় স্বার্থে আজ সব চাইতে বেশী প্রয়োজন 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র একটি সঠিক ও গ্রহনযোগ্য মূল্যায়ণ। এতে বিভ্রান্তির যেমন অবসান ঘটবে, তেমনি জাতীয় জীবনে ফিরে আসবে স্বস্তিবোধ ও স্থিতিশীলতা। বিশেষ করে জাতি ফিরে পাবে একটি সঠিক দিক্‌দর্শন। মূলতঃ এই লক্ষ্যে লেখকের,

www.icsbook.info

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বইটি একটি স্বার্থক প্রয়াস বলে আমি মনে করি। বইটিতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে একজন অংশগ্রহণকারী হিসাবে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি সমাজ বিজ্ঞানের একজন গবেষক হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বাধীনতার অংগীকার ও জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে যা যা বিবৃত হয়েছে, ঐতিহাসিক তথ্য সমর্থনে লেখক তাকে সমৃদ্ধ ও গ্রহণীয় করার প্রয়াস পেয়েছেন। বিশেষতঃ "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ঃ অনুভূতি বনাম অপপ্রচার" শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে লেখক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এর প্রথমটি হচ্ছে, অন্যায়, শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, দ্বিতীয়তঃ জনপ্রতিনিধিত্বমূলক বা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, এবং তৃতীয়তঃ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অংগীকার। সাথে সাথে লেখক 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র নামে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের দুরভিসন্ধির ব্যাপারেও জাতিকে সতর্ক করে দেবার প্রয়াসে কিছু সহায়ক তথ্যের উপস্থাপন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে কেন্দ্রবিন্দু ধরে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুর উপর লিখিত লেখকের প্রবন্ধ সংকলণটি অনুসন্ধিৎসু ও যুক্তিবাদী মনের পাঠক সমাজের কাজে সমাদৃত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বইটির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে লেখক মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হিসাবে যা বলতে চেয়েছেন, তার সমর্থনে পরিমিত তথ্য ও যুক্তির অবতারণা করেছেন। ইতিপূর্বে লেখকের প্রকাশিত, *স্বাধীনতার ঘোষণা ও বাংলাদেশ* (১৯৯০) এবং ***Social Justice in Bangladesh*** (1991) শীর্ষক দু'খানি গ্রন্থ সুধী মহলে প্রশংসিত হয়েছে। যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে আমাদের সংবিধানটি প্রণীত হয়েছে, আলোচ্য বইটিতে সংকলিত বিভিন্ন প্রবন্ধের আলোচনা ও বিশ্লেষণ সেই ভিতকে আরও মজবুত করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি অধ্যাপক আবদুন নূরের, ***"মুক্তিযুদ্ধের চেতনা"***, শীর্ষক বইটির সাফল্য, বহুল প্রচার ও এর উপর কার্যকর আলোচনা প্রত্যাশা করছি।

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ লিবার্টি ফোরাম
ঢাকা

তারিখ ঃ ১/১২/৯২ ইং

www.icsbook.info

www.icsbook.info

লেখকের কথা

জর্জ বার্ণাড'শ তাঁর বিখ্যাত "আর্মস এণ্ড দি ম্যান" নাটকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক সৈনিকদের ব্যঙ্গ করে "চকলেট ক্রীম সোলজার্স" বলে অভিহিত করেছেন। আলোচ্য বইটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী বলে আত্মপরিচয়দানকারী সেই সকল রাজনীতিবিদ-বুদ্ধিজীবীদের কার্যক্রমকে ঘিরে যারা ব্যক্তিগত স্বার্থ অথবা সৎসাহসের অভাবের কারণে সেদিন মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের ঝুঁকি থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়েই শুধু রাখেননি, উপরন্তু, হানাদার বাহিনীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সাংবাদিকতা, অধ্যাপনা, ওকালতি, বেতারে অনুষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার দুই দশক পর আজ তারা বোধগম্য কারণেই 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' এবং 'স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ' বিতর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আর একটি মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন!

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, কুণ্ডেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কিশোরী খালেদা হানাদার বাহিনীর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা বর্জন করেছিল। গৃহবধূ জয়নাব তখন স্বাধীন বাংলা বেতারের নির্দেশকে শিরোধার্য করে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক অচল ঘোষিত ৫০০ (পাঁচশত) টাকার নোট ব্যাংকে জমা করেনি। বিধবা লায়লা ঘরে বসে থাকা তার কলেজগামী সন্তানকে এই বলে মুক্তিযুদ্ধে ঠেলে দিয়েছিলেন যে, "বাবা! মিলিটারীরা আমার সামনে থেকে তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করবে তা আমি সহ্য করতে পারব না, তাঁর চাইতে দেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে শহীদ হওয়া শ্রেয়।" কাপ্তাই হাই স্কুলের হাফেজ মওলানা আবদুল কাদের চৌধুরী তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়গামী তিন সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে এই বলে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন যে, "আমার যদি আজ দুটি হাত ভাল থাকত, তাহলে এই বৃদ্ধ বয়সে আমিও তোমাদের সাথে অস্ত্র নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতাম।" উপরোল্লিখিত খালেদা জয়নাব-লায়লা-আবদুল কাদের-- এরা কেউ সীমান্তের ওপারে থেকে ফিরে আসা মুক্তিযোদ্ধা নন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে কখনও লিখা হবে না এদের ত্যাগের কথা। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং এমনকি, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একাত্তরের সেই উত্তাল দিনগুলিতে এরা যা করেছিলেন, তাতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে এক ধরণের চেতনা সক্রিয় ছিল। এভাবে এদেশের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, "বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ" মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলীর স্বীকারোক্তি মতে, "একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল"।

www.icsbook.info

দুই দশক পূর্বের কিশোরী খালেদা আজ পরিণত বয়স্কা গৃহিনী। গৃহবধু জয়নাব আজ পাঁচ সন্তানের জননী। বিধবা লায়লা আজ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। স্কুল শিক্ষক হাফেজ আবদুল কাদের চৌধুরী আজ আর ইহলোকে নেই। খালেদা-জয়নব-লায়লা আজ আর কোন মুক্তিযুদ্ধ চায়না। তারা দেশে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা কামনা করে, সমাজের উন্নয়ন চায় এবং তাঁদের সন্তানরা হিংসা-হানাহানিমুক্ত, সুস্থ ও সম্প্রীতিপূর্ণ একটা পরিবেশ গড়ে উঠুক— এটাই কামনা করে। তারা কেউ আজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন বা নির্মূল আন্দোলনের নামে দেশে হিংসা-নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী মারমুখী কোন কর্মসূচীর সাথে জড়িত নেই। কিন্তু যুগপৎ বিস্ময় ও উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আজ যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে সমাজকে অস্থিতিশীল করছেন, তাঁদের অধিকাংশই খুণী টিক্কা খান প্রশাসনের আনুগত্যকারী রাজনীতিবিদ-বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। মুক্তিযুদ্ধের মত একটি ঝুঁকিপূর্ণ ও স্বার্থত্যাগকারী মহান জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণের মত সৎসাহস সেদিন তাদের হয়নি। এমন কি, কিশোরী খালেদা ও গৃহবধূ জয়নাবের চেতনার বহিঃপ্রকাশও তখন তারা ঘটাতে সক্ষম হননি। সেদিন তারা প্রাণভয়েই হউক, আর সৎসাহসের অভাবের কারণেই হউক, একাত্তরের হানাদার বাহিনীর আনুগত্য করে কোনভাবেই যে মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক ভূমিকা পালন করেননি, তা বলাই বাহুল্য। তাই আজ জাতির সামনে এদের স্বরূপ উন্মোচন যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একটি সঠিক ও গ্রহণযোগ্য কাঠামো প্রণয়নের। 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বা বিরোধী মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কোন ব্যাপার নয়। এটি সম্পূর্ণভাবে একটি অনুভবের বিষয়। একজন স্বাধীন দেশের মানুষের অনুভূতি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়, এবং একই সাথে একটি কঠিন দায়িত্ববোধের চেতনা।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা একটি বহুমাত্রিক ও বিস্তৃত পরিসরের বিষয় হলেও বর্তমান গ্রন্থভূক্ত প্রবন্ধসমূহ মূলতঃ জাতীয় রাজনীতি ও শিক্ষাঙ্গণকে ঘিরেই আবর্তিত। কেননা, জাতীয় জীবনের এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র আজ সবচাইতে বেশী প্রভাবিত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত চেতনাধারীদের কার্যক্রমের দ্বারা। প্রবন্ধগুলি সাধারণ পাঠকদের জন্য দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশের উদ্দেশ্যে ১৯৯১-৯২ সালের মধ্যে লিখিত। নানা কারণে লিখাগুলিতে কিছু বানান ও ব্যাকরণের ভুল সংশোধন করা সম্ভবপর হয়নি। কিছু প্রবন্ধকে সময়োপযোগী করার প্রয়োজনে পরিমার্জিত করতে হয়েছে। কোথাও একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। প্রবন্ধের অংগহানির কথা ভেবে পুনরাবৃত্তিসমূহ বাদ দেওয়া সম্ভবপর হয়নি। প্রবন্ধগুলি পুনঃ প্রকাশের অনুমতি

www.icsbook.info

প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সাময়িকী ও পত্রিকা সমূহের সম্পাদকমন্ডলীকে ধন্যবাদ। বইটি প্রকাশের সাথে যুক্ত হবার জন্য 'ইনষ্টিটিউট অব সোস্যাল রিসার্চ এন্ড ষ্টাডিজ'কে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশেষতঃ 'বাংলাদেশ লিবার্টি ফোরাম' এর চেয়ারম্যান সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী বইটির ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছে আমার স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্র চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র জিয়াউদ্দিন মোহাম্মদ তৈয়ব হোসেন চৌধুরী। প্রুফ রিডিং, কম্পিউটার সেটিং এবঙ পেষ্টিং এর মত সতর্কতাপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধায়ক জনাব কাজী আনোয়ার হোসেন। উভয়ের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। বইটি পাঠকদের কাছে গ্রহণীয় হলে নিজের শ্রমকে সার্থক ভাবব। প্রবন্ধসমূহে তথ্যগত বা ব্যাকরণজনিত সম্ভাব্য ভুলের জন্য সর্বতোভাবে আমিই দায়ী।

সর্বশেষে, এই লেখার শুরুতে উল্লেখিত খালেদা-জয়নাব-লায়লা ও আবদুল কাদের চৌধুরী যথাক্রমে আমার ভাগিনী, বড় বোন, জ্যাঠাইমা ও বাবা। এঁদের মধ্যে শোষক্তজন আজ আর ইহলোকে নেই। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে বইটি নিবেদিত।

আবদুন নূর
লোক প্রশাসন বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখ ঃ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯২

www.icsbook.info

www.icsbook.info

উৎসর্গ

মরহুম পিতা আবদুল কাদের চৌধুরীর স্মরণে যিনি
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শুধু সন্তানদেরকে পাঠিয়ে
সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি, হানাদার বাহিনীর
অব্যাহত নিপীড়নের প্রেক্ষাপটে
বৃদ্ধ বয়সে নিজেও সশস্ত্র
মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের
ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ।

www.icsbook.info

www.icsbook.info

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা

লেখকের কথা

১। স্বাধীনতার ঘোষণা, রাষ্ট্রীয় মৌলনীতি ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি ... ১৩

২। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা ও মেজর এম, এ, জলিল ... ১৮

৩। স্বাধীনতার অঙ্গীকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ২৪

৪। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ঃ অনুভূতি বনাম অপপ্রচার ... ৩১

৫। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধঃ ঐক্য বনাম বিভাজন ... ৪৯

৬। শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসঃ কারণ চিহ্নিতকরণ ... ৫৫

৭। সন্ত্রাসমুখর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মঙ্গলপ্রদীপ সংস্কৃতি ... ৬৪

৮। 'র্ধ্বিমূল' বনাম 'গণতন্ত্র' ঃ গণআদালতীদের ঐতিহাসিক বিপর্যয় ... ৭৭

পরিশিষ্ট

ক) ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার আম্রকাননে প্রবাসী বাংলাদেশ (মুজিবনগর) সরকার কর্তৃক ঘোষিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র ... ৮৫

খ) সত্তর এর নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ সংসদীয় কমিটি কর্তৃক পাকিস্তানের জন্য প্রণীত খসড়া শাসনতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ বিশেষ... ৮৭

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

স্বাধীনতার ঘোষণা, রাষ্ট্রীয় মৌলনীতি ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

[অবাক হবার বিষয় হচ্ছে, বিশ বৎসর পূর্বে ক্ষমতাসীন হয়ে যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হিসাবে 'সমাজতন্ত্র'—কে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মৌলনীতি হিসাবে শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন, তারাই আজ বিরানব্বইয়ে এসে দলীয় মেনিফেস্টো থেকে সমাজতন্ত্রকে বাদ দিয়ে বাজার অর্থনীতির কথা ঘোষণা করেছেন! কিন্তু 'সমাজতন্ত্রের' কারণে সৃষ্ট শিল্প পরিবেশ আজ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রতি বৎসর প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার মত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুরূপভাবে, 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র ছদ্মাবরণে এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে 'ইসলাম', 'মুসলিম' ও 'আল্লাহ'র নাম পর্যন্ত মুছে ফেলা হল। অথচ একাত্তরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে জনগণের প্রতি যে অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছিল তা হচ্ছে, "সাম্য", "মানবিক মর্যাদা" এবং "সামাজিক ন্যায়বিচার"; "সমাজতন্ত্র" বা "ধর্মনিরপেক্ষতা" নয়। এভাবে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত এবং জাতিকে লক্ষ্যহীন করে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী বলে আত্মপরিচয়দানকারী এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশে একটি অস্থিতিশীল সমাজের পটভূমি রচনা করেছেন]

চীন দেশে বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ হচ্ছে, 'চোখের এক পলক চাহনি হাজার শব্দের চাইতেও কার্যকর'। অনুরূপভাবে, বাংলাদেশের রক্তখচিত পতাকাটির দিকে তাকালে মনে হয়, একরাশ সবুজ প্রান্তর থেকে ভেসে উঠেছে রক্তস্নাত একখন্ড ভূমি, যা থেকে আজও রক্ত ঝরছে। লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু এর লক্ষ্য ও আদর্শের ব্যাপারে একুশ বছরেও আমাদের মাঝে অর্জিত হয়নি কোন ঐক্যমত। প্রায় প্রতিটি বিষয়েই চলছে বিতর্ক, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত এবং পরিণামে রক্তক্ষয়।

www.icsbook.info

স্বাধীনতার পর, রাষ্ট্র পরিচালনার মৌল আদর্শ হিসাবে 'সমাজতন্ত্রকে'. যখন শাসনতন্ত্রের সাথে জুড়ে দেয়া হল, তখন এর প্রস্তাবনায় (Preamble)বলা হল যে,'সমাজতন্ত্র'ই হচ্ছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বাধীনতার অংগীকার। কিন্তু 'সমাজতন্ত্রের' আদর্শ আমাদের দেশে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত শিল্প উদ্যোগকে নিরুৎসাহিত করেছে, অপরদিকে, জাতীয়করণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের অব্যবস্থা উৎপাদনকে করেছে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। ফলে দেশের শিল্পখাতে সৃষ্টি হয়েছে উৎপাদনহীনতা, বৃদ্ধি পেয়েছে বেকারত্ব এবং এর ফলে নতুনভাবে সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক অসন্তোষ ও অস্থিরতা। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব জহিরউদ্দিন খানের মতে, সমাজতন্ত্রের কারণে সৃষ্ট শিল্প পরিবেশ আজ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রতি বৎসর প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার মত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১] অবাক হবার বিষয় হচ্ছে, বিশ বৎসর পূর্বে ক্ষমতাসীন হয়ে যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হিসাবে 'সমাজতন্ত্র'কে রাষ্ট্রীয় আদর্শরূপে 'শাসনতন্ত্রের মৌল নীতিমালায়' অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন, তারাই আজ বিরানব্বইয়ে এসে দলীয় আদর্শ থেকে 'সমাজতন্ত্রকে' বাদ দিয়ে বাজার অর্থনীতির কথা ঘোষণা করেছেন।

অনুরূপভাবে, 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে যখন রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল, তখন জাতিকে বোঝান হয়েছিল যে, 'ধর্মনিরপেক্ষতা'ই হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার অংগীকার, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। কিন্তু 'ধর্মনিরপেক্ষতার' ছদ্মাবরণে এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে 'ইসলাম', 'মুসলিম' ও 'আল্লাহ্‌র' নাম মুছে ফেলা হল, এমনকি, হিন্দুদের বিরোধীতার মুখে অত্র এলাকার অনগ্রসর মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে 'ইক্‌রা' বা পড়া সম্পর্কিত পবিত্র কোরআনের বিশ্বজনীন বাণীটি পর্যন্ত তুলে দেয়া হল। স্বভাবতঃই এতে অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠল এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী, যারা "আল্লাহু আক্‌বর" ধ্বনি দিয়ে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে অকাতরে শাহাদাত বরণ করেছিল। এভাবে 'জাতীয়তাবাদের' নামে ভাষাভিত্তিক উগ্র বাংগালী জাতীয়তাবাদের ফলে সৃষ্ট পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী অবাংগালী উপজাতীয়দের বিদ্রোহ এবং 'গণতন্ত্রের' নামে একদলীয় স্বৈরাচার ইত্যাদি এদেশের মানুষকে হতাশ ও বিক্ষুব্দ করে তুলেছিল। স্বাধীনতার নামে

---

[1] "LDC to NIC: Prospects for Bangladesh," *The Daily Star*, Dhaka, November 23, 1991

www.icsbook.info

স্বেচ্ছাচারিতার এই তিক্ত জ্বালা মানুষকে এক সময় পরিবর্তনের নেশায় মরিয়া করে তুলল।

এমন এক অস্বস্থিকর পরিস্থিতিতে, '৭৫ এর রক্তক্ষয়ী পরিবর্তন' এবং '৭৭ এর সিপাহী-জনতার বিপ্লবের' প্রেক্ষাপটে, দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। তিনি দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে মরহুম কবি ও সাহিত্যিক হাসান হাফিজুর রহমানকে প্রকল্প পরিচালক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের মরহুম প্রফেসর ডঃ মফিজুল্লাহ্ কবিরকে চেয়ারম্যান করে, দেশবরেণ্য ইতিহাস গবেষকদের সমন্বয়ে নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রমাণিকরণ কমিটি (Authentication committee) গঠন করেন। উক্ত কমিটি কর্তৃক সংকলিত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৮২ সালে প্রকাশিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, এর তৃতীয় খন্ডের ৫নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রটি'র কথা আমরা প্রথমে জানতে পারি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার এক দশক পর প্রকাশিত স্বাধীনতার উক্ত ঘোষণাপত্রটি পড়ে আমরা বিস্মিত হয়েছি একথা জেনে যে, একাত্তরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে, আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে জনগণের প্রতি যে অংগীকার ব্যক্ত হয়েছিল তা হচ্ছে, "সাম্য", "মানবিক মর্যাদা" এবং "সামাজিক ন্যায়বিচার"; 'সমাজতন্ত্র' বা 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নয়।[২]

আরও অবাক হবার বিষয় হচ্ছে, সত্তর এর নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে যে সকল জন প্রতিনিধিবৃন্দ স্বাধীন প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশে "সাম্য", "মানবিক মর্যাদা" ও "সামাজিক ন্যায়বিচার" প্রতিষ্ঠার অংগীকার নিয়েছিলেন, তারাই স্বাধীনতা উত্তর '৭২ এর শাসনতন্ত্র প্রণয়নকালে লক্ষ শহীদের রক্তে রণ্জিত স্বাধীনতার এই ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রটিকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৭৮৯ সালে সংগঠিত ফরাসী বিপ্লবীদের কণ্ঠে উচ্চারিত "স্বাধীনতা", "সাম্য" ও "ভ্রাতৃত্বের" ঐতিহাসিক শ্লোগান সমূহ আজও ফরাসী দেশের সর্বত্র এবং এমনকি, প্রতিটি মুদ্রায়ও খোদিত করা হয় শুধু বর্তমান প্রজন্মকে তাদের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন রাখার জন্য।

---

[২]হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র* (ঢাকাঃ গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২), ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫।

www.icsbook.info

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক অংগীকারপত্রটি ঘোষিত হয়েছিল একাত্তরের ১০ই এপ্রিল কুষ্টিয়ায় আম্রকাননে। ঘোষণাটিকে কার্যকর করার লক্ষ্যে এর মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে ১৭ই এপ্রিল (সত্তর এর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে) গঠন করা হয়েছিল 'প্রবাসী মুজিবনগর সরকার।' আমাদের দূর্ভাগ্য যে, এদেশে প্রতি বৎসর ১৭ই এপ্রিল 'মুজিবনগর দিবস' হিসাবে পালিত হয়, কিন্তু ১০ই এপ্রিলকে স্মরণ করা হয় না। তাই চট্টগ্রাম 'লিবার্টি ফোরামের' পক্ষ থেকে ১০ই এপ্রিলকে বাংলাদেশের "প্রজাতন্ত্র দিবস" হিসাবে ঘোষণা প্রদানের দাবী উত্থাপন করা হয়েছে। সাথে সাথে, স্বাধীনতার অংগীকারের প্রতি দেশবাসীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং বিশেষতঃ এর প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল একদল দক্ষ ও সৎ কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটিকে দেশের সকল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করারও দাবী জানানো হয়েছে।

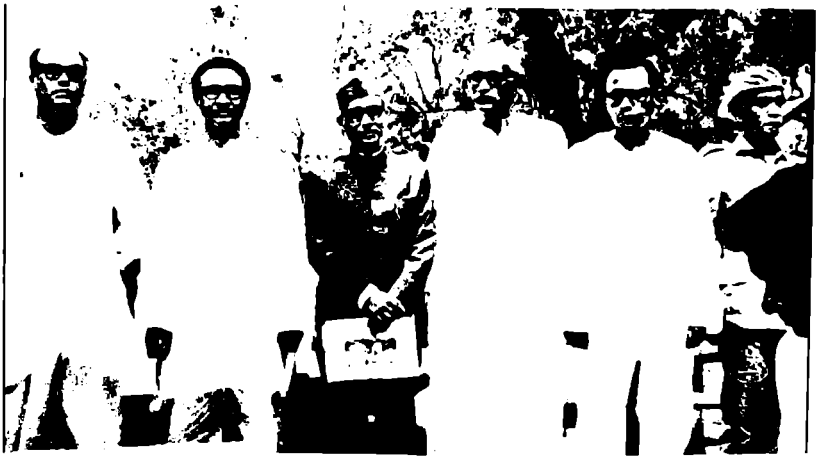

স্বাধীনতার ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংগঠিত প্রবাসী বাংলাদেশ (মুজিবনগর) সরকার কর্তৃক প্রকাশ্যে শপথ গ্রহন অনুষ্ঠান শেষে নেতৃবৃন্দ। বাম থেকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম; প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ; পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমদ; অর্থমন্ত্রী মনসুর আলী; স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পূনর্বাসন মন্ত্রী জনাব কামরুজ্জমান এবং মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্নেল (অবঃ) এম. এ. জি. ওসমানী, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১ ইংরেজী।

আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণায় উল্লিখিত "সাম্য", "মানবিক মর্যাদা" ও "সামাজিক ন্যায়বিচারকে" যদি প্রথম থেকেই আমাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসূচী এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করা হত, তাহলে বিগত বিশ বৎসরে আমাদের মাঝে এক ধরণের 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' (Political Culture) গড়ে উঠত, যেখানে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ

www.icsbook.info

জাতীয় আয়বৃদ্ধি বা জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন না করে নিজেদের জন্য পারিতোষিক বৃদ্ধি বা করমুক্ত গাড়ী আমদানীর ব্যবস্থা করে 'অসাম্যের' উদাহরণ সৃষ্টিতে নিঃশঙ্কচিত্ত হতে পারতেন না। স্বাধীনতার বিশ বছর পরও আমরা একে অপরকে 'একাত্তরের ঘাতক', 'বিদেশী দালাল', 'স্বাধীনতার শত্রু' ইত্যাদি অমর্যাদাকর বিশেষণে ভূষিত করতাম না। এবং আমাদের জাতীয় আয় বা উন্নয়নের ফসল নিম্ন পর্যায়ের শতকরা ৪০ ভাগ পরিবারকে ক্রমাগত বঞ্চিত করে (জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র ১৯ ভাগ দিয়ে) উচ্চ পর্যায়ে অবস্থানকারী শতকরা মাত্র ৫ ভাগ পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত (জাতীয় আয়ের শতকরা ২৯ ভাগ) হতে পারত না।[৩] এভাবে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত এবং জাতিকে লক্ষ্যহীন করে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী বলে আত্মপরিচয়দানকারী এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশে একটি অস্থিতিশীল সমাজের পটভূমি রচনা করেছেন।

অবশ্য জাতির জন্য একটি আশাপ্রদ ঘটনা হচ্ছে, ১৯৭৮ সালে শাসনতন্ত্রে আনীত এক সংশোধনীর মাধ্যমে "সামাজিক ন্যায়বিচার"কে বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলনীতি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে (১৯৭৮ সনের ২য় ঘোষণাপত্র, আদেশ নং ৪)। এই বিষয়টি আজ জননির্বাচিত জাতীয়তাবাদী সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য হিসাবেও ঘোষিত হয়েছে (১৯৯১–৯২ সালের উন্নয়ন বাজেট)। কিন্তু এখানে মৌলিক প্রশ্নটি হচ্ছে, "সামাজিক ন্যায়বিচারের" সংজ্ঞা কি হবে? এর কর্মকাঠামো (Working Framework) কিভাবে নির্ধারিত হবে? সমাজে "ন্যায়বিচার" প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বের স্বরূপ কি হবে? দেশের অর্থনীতি, উন্নয়ন কৌশল এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ধরণ কি হবে? এসকল প্রশ্নকে সামনে রেখে রচিত হয়েছে লেখকের, *স্বাধীনতার ঘোষণা ও বাংলাদেশ'* (১৯৯০) এবং *Social Justice in Bangladesh* (1991) শীর্ষক দু'খানি গ্রন্থ। প্রত্যাশা এটাই যে, এই ক্ষুদ্র প্রয়াস জাতির জন্য কাঙ্খিত 'রাজনৈতিক সংস্কৃতির' চর্চা এবং উন্নয়নের লক্ষ্য পুনঃনির্ধারণ ও সঠিক কর্মসূচী প্রণয়নে সহায়ক হবে।

[বিগত ১২ই মে, ১৯৯২ ইংরেজী ঢাকা জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে 'লিবার্টি ফোরাম' এর উদ্যোগে লেখকের রচিত, *স্বাধীনতার ঘোষণা ও বাংলাদেশ* গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষিপ্ত সার]

---

[৩] Palli Karma Sahayak Foundation, *Annual Report*. 1990-91, Table 1-1, p-12

www.icsbook.info

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা ও মেজর এম, এ, জলিল*

[মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক ও বাহক হিসাবে আত্মপরিচয়দানকারীগণ বাংলাদেশটাকে নিজেদের পৈত্রিক তালুক হিসাবে মনে করেন। তারা মনে করেন একমাত্র তারাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক ও স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি এবং যারা তাদের মতামত ও আদর্শের বিরোধীতা করে, তাদেরকে ঢালাওভাবে স্বাধীনতা বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেন। অপরদিকে, মুক্তিযুদ্ধের ৯নং সেক্টরের কমাণ্ডার আজীবন মুক্তি সংগ্রামী মেজর (অবঃ) এম, এ, জলিলের মতে, "শোষণ—জুলুমের বিরুদ্ধে আপোষহীন চেতনার নামই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা"। তাঁর নিজের জীবনটাই ছিল এ সংজ্ঞাটির যথার্থ বহিঃপ্রকাশ। অতএব, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কোন্ সংজ্ঞাটি আজকের ধ্বংসোন্মুখ বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক তরুণ সমাজের কাছে গ্রহণীয়, সেটাই আজ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়]

"মুক্তিযুদ্ধের চেতনা" নামক একটি স্নায়ু উত্তেজক শ্লোগান সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজ জীবনকে ভয়াবহরূপে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। এক শ্রেণীর রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী যাদের অধিকাংশই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে কোনভাবেই অংশ গ্রহণ করেননি, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র নামে জাতিগত বিভেদ সৃষ্টি এবং সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা ও হিংসা হানাহানির বীজ ছড়ানোর কাজে তৎপর হয়েছেন। এবং তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের পরের প্রজন্ম অর্থাৎ আজকের তরুণ সমাজ শিক্ষা ও উৎপাদন বিমুখ হয়ে নিজেদের মধ্যে সন্ত্রাস ও আত্মঘাতী তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। এতে দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, ব্যহত হচ্ছে দেশের উৎপাদন কর্ম, অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে দেশের সমাজ জীবন এবং হুমকির সম্মুখীন হয়েছে জাতীয় স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র অস্থিত্ব। লক্ষ্যণীয় বিষয়

---

*সৌজন্যে ঃ*দৈনিক ঈশান*, চট্টগ্রাম, ২৩শে মার্চ, ১৯৯২ ইংরেজী (আংশিক সংশোধিত)।

www.icsbook.info

হচ্ছে, এসকল রাজনৈতিক আগ্রাসনমুখী বা সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবী মহল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দোহাই দিয়ে জাতিগত বিভেদ সৃষ্টি বা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার ব্যাপারে যতটা তৎপর, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' বলতে কি বুঝায় সেটা জাতির সামনে সংজ্ঞায়িত করার ব্যাপারে ততটা আগ্রহী নন! তবে তাদের বক্তৃতা-বিবৃতি ও আচার আচরণ থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে ঃ

১) মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারীদের প্রথম বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক ও বাহক হিসাবে আত্মপরিচয়দানকারীগণ বাংলাদেশটাকে নিজেদের পৈত্রিক তালুক হিসাবে মনে করেন। তারা মনে করেন একমাত্র তারাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক ও স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি এবং যারা তাদের মতামতের বিরোধীতা করে, তাদেরকে ঢালাওভাবে স্বাধীনতাবিরোধী বলে আখ্যায়িত করেন। এ জাতীয় দৃষ্টিভংগী ও আচরনকে সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয়, 'রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা'। উদাহরণস্বরূপ, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় ৯নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর এম, এ, জলিল তাঁর প্রতিবাদী ভূমিকার কারনে আজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারীদের দৃষ্টিতে রাজাকার! অনুরূপভাবে, চট্টগ্রাম বেতার থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানকারী সাহসী মুক্তিসেনা জিয়াউর রহমানকে তারা স্বাধীনতার যোদ্ধা হিসাবে স্বীকার করতে নারাজ!

২) মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারীদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় সংগ্রামে অংশগ্রহণ না করে হানাদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক দখলীকৃত এলাকায় পত্রিকা সম্পাদনা, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, রেডিও টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করা বা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর পক্ষে পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে খুনী ইয়াহিয়া-টিক্কা খান প্রশাসনের সহযোগিতা করে থাকলেও আজ স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হিসাবে আত্মপরিচয় প্রদানে সোচ্চার হওয়া। এ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের ৫নং সেক্টরের কমান্ডার লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলীর বক্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, "সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ব্যবহার করছেনা। স্বার্থবাদী রাজনীতিবিদ্‌রা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ব্যবহার করছে"।[১]

---

[১] বিগত ১৭ই জুলাই ঢাকার একটি হোটেলে মুক্তিযুদ্ধের ৫নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের পুণর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে প্রদত্ত লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলীর ভাষণ। উক্ত ভাষণে তিনি আরও বলেন,"আসলে তখনকার (১৯৭১ সালের) সাড়ে সাত কোটি মানুষ সকলেই ছিল মুক্তিযোদ্ধা। যারা মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে ও সাহস দিয়ে সাহায্য করেছে, তারা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা"। তিনি আরো বলেন, "স্বাধীনতার পর দেশে মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা বিতর্ক সৃষ্টি করে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়েছে"। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ১৮ই জুলাই, ১৯৯২ ইংরেজী।

www.icsbook.info

৩) একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বাসঘাতকতা ও জুলুমের বিরুদ্ধে জেহাদী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এদেশের অগণিত মুসলমান তরুণ "আল্লাহু আকবর" ধ্বনিতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারীদের আচরনগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মাঝে মাঝে ইস্যু সৃষ্টি করে পথে-ঘাটে দাঁড়ি-টুপিওয়ালা নিরীহ পথচারীকে মার-ধর করা, কোরআন-হাদীস ও ধর্মীয় বইয়ের দোকান জ্বালান এবং ইসলাম ধর্মকে মৌলবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করে জনগণের মধ্যে এর প্রভাব ও জাগরণকে প্রতিহত করার ব্যাপারে অগ্নিশপথ গ্রহণ করা। এমন বহু ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশে-পাশের এলাকায়, চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অংগণে, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত "সম্প্রীতি সম্মেলনে" (১লা ও ২রা নভেম্বর, ১৯৯১ ইংরেজী) এবং সম্প্রতি রাজধানীতে অনুষ্ঠিত "জাতীয় কবিতা সম্মেলনে" (ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২)।

৪) মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারীদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে, "সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা" অর্থাৎ 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র নামে এদেশের দীর্ঘদিনের প্রচলিত প্রথার স্থলে জোর করে পরসংস্কৃতি প্রবর্তন করা। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পরিবর্তে মংগল প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা, শহীদদের আত্মার মাগফেরাতের জন্য মুনাজাতের বদলে দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন বা পুষ্পার্ঘ অর্পণ; 'মরহুম' শব্দের স্থলে 'প্রয়াত'; 'সভাপতিত্বের' স্থলে 'পৌরহিত্য' শব্দের প্রচলন ইত্যাদি। এদের দৃষ্টিতে পূজা কমিটির আহবায়ক হলে, হিন্দুদের ধর্মীয় সভায় যোগ দিয়ে বক্তৃতা করলে বা হিন্দুধর্মের দেব-দেবীদের উপাখ্যান নিয়ে সাহিত্য রচনা করলে প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী হওয়া যায়। কিন্তু কেউ যদি মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন বা ইসলামের শিক্ষা ও মূল্যবোধ নিয়ে কথা বলেন, তাহলে তাকে মৌলবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী, স্বাধীনতা বিরোধী, রাজাকার ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হয়।

৫) মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারীদের আচরণগত পঞ্চম বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে, সাংবাদিকতার স্বৈরাচার, অর্থাৎ স্বপক্ষীয় সংবাদ অতিরঞ্জিত করে ছাপান, কিন্তু প্রতিপক্ষীয় সংবাদ বা বিবৃতি প্রকাশ না করা বা বিকৃত করে ছাপান। সাংবাদিকতার স্বাধীনতার নামে 'ইয়েলো জার্নালিজম', অর্থাৎ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন সংবাদ পরিবেশন বা সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিদের চরিত্র হনন করা চলবে, কিন্তু বাংলাদেশ দন্ড বিধির ৫০১ ধারামতে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মর্যাদাহানির মামলাও করা যাবে না!

www.icsbook.info

৬) মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারীদের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে, নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং জবাবদিহিমূলক চেতনার অবলুপ্তি ঘটান। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ত্বশাসনের নামে এক শ্রেণীর অধ্যাপকগণ ইদানিং শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদেরকে পাঠদান থেকে বঞ্চিত করে বহিরাংগণের রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে পড়েছেন। এবং এঁদেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উস্কানীতে ক্যাম্পাসে ছাত্রদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলসমূহের মধ্যে সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন রিপোর্টে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

৭) মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারীদের বক্তব্যের একটি বড় অসম্পূর্ণতা হচ্ছে, তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বলতে শুধু পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে নয়মাসব্যাপী যুদ্ধকেই বুঝিয়ে থাকেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ যে একটি সুদীর্ঘ ধারাবাহিক সংগ্রামী প্রক্রিয়ার শেষ পরিণতি, এ বিষয়টি তারা সযত্নে পরিহার করেন। কেননা, তাদেরই কেউ কেউ একাত্তরের পূর্বের ঘটনাবলীতে এদেশের স্বাধীকার আন্দোলনের বিরোধীতা করেছিলেন।

আজকের বাংলাদেশে বহু স্বনামখ্যাত বুদ্ধিজীবী একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় ও তৎপূর্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। পাকিস্তান আমলে তারা রাজনীতিবিমুখ ও অনুগত ছাত্র হিসাবে পরিগণিত হতেন। এদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর খুনী টিক্কাখানের নির্দেশমত নিয়মিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ করেছেন, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অনার্স ও মাষ্টার্স পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর, বাংলাদেশ সরকার তাদের সেই পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করে ৭২ সালে পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে। হানাদার বাহিনীর অনুগত সুবোধ বালকদের অনেকেই আজকের বাংলাদেশে প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী বা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি হিসাবে আত্মপরিচিতি লাভে সচেষ্ট।

অপরদিকে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমি রচনাকারী যে মহান ভাষা আন্দোলন, সেই ভাষা আন্দোলনের বহু নায়ক আজ উপেক্ষিত। অধ্যক্ষ আবুল কাসেম, মীর্জা গোলাম হাফিজ, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরাফ, অধ্যাপক শাহেদ আলী, জনাব আবদুল লতিফ, বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী ও অধ্যাপক আবদুল গফুর প্রমুখ নেতাদের বলিষ্ঠ সংগ্রামী ভূমিকা, আত্মত্যাগ, চাকুরীচ্যুতি, কারাবরণ ও নির্যাতন ভোগ ইত্যাদি বিস্মৃত হবার নয়। ১৯৬১ সালে ঢাকার বুকে প্রতিষ্ঠিত যে 'বাংলা একাডেমী' ভাষা

www.icsbook.info

আন্দোলনকারীদের বহু ত্যাগের ফসল, সেই একাডেমী মঞ্চে উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গকে কখনও সম্মানিত হতে দেখা যায়নি!

৮) ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও সংস্কারমুক্ত চিন্তা এবং প্রগতি ও মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত চেতনাধারীদের সর্বশেষ টার্গেটটি হচ্ছে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী। বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর অপ্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে তাদের যুক্তি খুবই শাণিত। একাত্তরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর সাহসী ভূমিকার কথা স্বীকার করার ব্যাপারেও তাদের আড়ষ্টতা লক্ষ্যণীয়। তাদের কেউ কেউ এমন অভিমতও ব্যক্ত করেছেন যে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা "কেচ্ছা মাত্র"!

বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র ও চতুষ্পার্শে বন্ধুদেশ পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রে অনুৎপাদনশীল ও ব্যয়বহুল সামরিক বাহিনীর অপ্রয়োজনীয়তার কথা প্রচারে তারা সোচ্চার হলেও সীমান্তের ওপার থেকে পরিচালিত বঙ্গভূমি আন্দোলন; পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বাহিনীর হামলা; দক্ষিণ সীমান্তে মায়নমার (বার্মা) বাহিনীর আক্রমনাত্মক মহড়া ও ভারত কর্তৃক অন্যায়ভাবে তালপাট্টি দ্বীপ দখল, তিনবিঘা করিডোর হস্তান্তরে দীর্ঘসূত্রিতা, ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে গঙ্গা নদীর পানি প্রবাহ থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিতকরণ এবং সীমান্তে অবাধ চোরাচালান, এদেশের সংস্কৃতি বিরোধী ভারতীয় বই-পুস্তক ও ভি. সি. আর. এর অবাধ বেচা-কেনা, 'পুশ ব্যাকের' নামে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় নাগরিকদের 'পুশ ইন' এবং সর্বোপরি, নির্মূল কমিটি ও গণআদালতী তৎপরতার মাধ্যমে দেশব্যাপী নৈরাজ্য সৃষ্টির অন্তরালে 'অখন্ড ভারত আন্দোলনের' মত সার্বভৌমত্ব বিরোধী তৎপরতার ব্যাপারে তাদের রহস্যজনক নিরবতা লক্ষ্যনীয়।

মোটামুটিভাবে এই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী বলে আত্মপরিচয়-দানকারীদের মন-মানসিকতা ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য। তাদের কর্মতৎপরতার মূলে রয়েছে বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি এক ধরনের অসহিষ্ণুতা। এটা স্বৈরাচারী মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। রাজনীতি বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা যায় "রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা।" এই ধরণের স্বৈরাচারী মানসিকতার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন মরহুম মেজর এম, এ, জলিল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনকারী পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বহু বাংগালী মেজর পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। ব্যতিক্রম শুধু মেজর এম, এ, জলিল। তিনি মেজর হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন

www.icsbook.info

এবং স্বাধীনতার আঠার বৎসর পর, মেজর হিসাবেই প্রায় কপর্দকশূণ্য অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। আজীবন সংগ্রামী এহেন ত্যাগী মুক্তিযোদ্ধা 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র একটি সুন্দর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তার রচিত *অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা* (১৯৮৮) শীর্ষক পুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ৯নং সেক্টরের কমান্ডার আজীবন মুক্তিসংগ্রামী মেজর এম, এ, জলিল লিখেছেন ঃ "শোষণ–জুলুমের বিরুদ্ধে আপোষহীন চেতনার নামই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা"।[২] তাঁর নিজের জীবনটাই ছিল এই সংজ্ঞাটির যথার্থ বহিঃপ্রকাশ। মরহুম মেজর জলিলের এক স্মরণ সভায় মুক্তিযুদ্ধের অপর সেক্টর কমান্ডার লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী বলেন ঃ "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল এদেশকে শৃংখলিত হতে দেব না। ..... সবাই মিলে দেশ গড়ব এবং জাতি হিসাবে সুখ–শান্তি ও আত্মমর্যাদার সাথে বেঁচে থাকব– এটাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র চেতনা।"[৩] অতএব, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কোন্ সংজ্ঞাটি আজকের ধ্বংসোন্মুখ বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক তরুণ সমাজের কাছে গ্রহণীয়, সেটাই আজ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়।

---

[২]মেজর (অবঃ) এম, এ, জলিল, *অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা* (ঢাকা ঃ ইতিহাস পরিষদ, ১৯৮৮), পৃঃ ৩।

[৩]বিগত ২৩শে নভেম্বর (১৯৯২) মেজর এম, এ, জলিলের তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত স্মরণ সভায় প্রদত্ত লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলীর বক্তৃতা। দেখুন *দৈনিক মিল্লাত*, ঢাকা, ২৪শে নভেম্বর, ১৯৯২ ইংরেজী।

www.icsbook.info

স্বাধীনতার অঙ্গীকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা*

[স্বাধীনতার ঘোষক কে—এ' নিয়ে বির্তকে আমরা কাটিয়ে দিয়েছি ২০টি বছর। কিন্তু কথা বলিনি ১৯৭১—এর ১০ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার (মুজিবনগর) আম্রকাননে ঘোষিত ঐতিহাসিক 'স্বাধীনতার সনদ' নিয়ে, যে সনদে স্বাধীনতার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। কথা তুলিনি সে অঙ্গীকার বাস্তবায়নের পথ ও পাথেয় নিয়েও। অথচ এ অঙ্গীকারই ছিল আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে আজ থেকে প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে। এই সুদীর্ঘ সময়ে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও কর্ণফুলীর প্রবাহে অনেক পানি গড়িয়েছে, জাতীয় জীবনে ঘটেছে বহু পরিবর্তন। কিন্তু কাংক্ষিত লক্ষ্যে আমাদের তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। আমরা যেন ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বিশ্ব আর বিকশিত চিন্তাধারার বিপরীতমুখী স্রোতে প্রবাহিত হচ্ছি। এখনও বির্তকে লিপ্ত রয়েছি আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক কে ছিলেন সে বিষয়টিকে ঘিরে।

বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান উভয়েরই অবদান অনস্বীকার্য। উভয় নেতাই জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। বিতর্ক অবসানের লক্ষ্যে আমরা যদি স্বীকার করেও নেই যে উভয় নেতাই স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, তাহলে বলতে হয়, সে ঘোষণার কার্যকারিতা শেষ হয়েছে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পনের মাধ্যমে। কাজেই স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় জীবনে যে প্রশ্নটি সর্বাধিক গুরুত্বের দাবীদার সেটি হচ্ছে, স্বাধীনতার ঘোষণায় এদেশের জনগণের জন্য কি অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছিল? কি প্রতিশ্রুতিতে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে?

স্বাধীনতার অঙ্গীকার ঃ

আমরা কি সবাই জানি যে আজ থেকে ২০ বৎসর পূর্বে '৭১ এর এপ্রিল মাসে মুজিব নগরে জাতির জন্য 'সামাজিক ন্যায়বিচারের' অঙ্গীকার জানিয়েই

---

*সৌজন্যেঃ *পাক্ষিক পালাবদল,* ঢাকা, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৬–৩০শে জুন, ১৯৯২ ইংরেজী

www.icsbook.info

ঘোষিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক সনদ? পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর আওতায়, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হওয়া সত্ত্বেও সরকার পরিচালনা ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে 'ন্যায়বিচার' ভিত্তিক তাদের প্রাপ্য পাওনা থেকে দীর্ঘ বঞ্চনার প্রেক্ষাপটে, স্বাধীকারের দাবীর প্রতি '৭০-এর নির্বাচনে রায় প্রদান করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানী সামরিক জান্তা কর্তৃক এদেশবাসীর ব্যালটের রায়কে বুলেটের মাধ্যমে বানচাল করার অপচেষ্টার প্রত্যুত্তরে শুরু হয়েছিল '৭১-এর রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম। বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের শুরুতে, '৭০-এর নির্বাচনে বাংলাদেশ (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান) থেকে নির্বাচিত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ কুষ্টিয়ার (মুজিবনগর) আম্রকাননে দ্রুত একত্রিত হয়ে ১০ই এপ্রিল (১৯৭১) দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের সম্মুখে নিম্নোক্ত ঘোষণাটি প্রদান করেছিলেন ঃ

> *"বাংলাদেশের জনগণ (১৯৭০-এর নির্বাচনে) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যেই ম্যান্ডেট প্রদান করিয়াছে সেই ম্যান্ডেট অনুযায়ী আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আমাদের সমন্বয়ে গণ পরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ -আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য 'সাম্য', 'মানবিক মর্যাদা' ও 'সামাজিক ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এ রূপান্তরিত করার ঘোষণা প্রদান করিতেছি।"*[১]

স্বাধীনতার এই ঘোষণাটিকে কার্যকর করার লক্ষ্যে গণপরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে ১৭ই এপ্রিল গঠিত হয়েছিল প্রবাসী মুজিবনগর সরকার এবং কর্ণেল (অবঃ) এম, এ, জি, ওসমানীকে নিযুক্ত করা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। অতএব, স্বাধীনতার ঘোষণায় উল্লেখিত 'সাম্য', 'মানবিক মর্যাদা', ও 'সামাজিক ন্যায়বিচার'- এই তিনটি শ্লোগানের মাধ্যমে তিনটি সুস্পষ্ট অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের প্রতি। এই অঙ্গীকারই ছিল আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা। জনগণের জন্য অনুরূপ অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছিল ১৭৮৯ সালে সংগঠিত ফরাসী বিপ্লবীদের কণ্ঠেও। 'স্বাধীনতা', 'সাম্য' ও 'ভ্রাতৃত্ব'-

---

[১] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, তৃতীয় খন্ড (ঢাকা ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২) পৃঃ ৫।

www.icsbook.info

ফরাসী বিপ্লবের সময় উচ্চারিত এই তিনটি রাজনৈতিক শ্লোগান আজও ফরাসী দেশের সর্বত্র এবং এমনকি, প্রতিটি মুদ্রায়ও খোদিত আছে শুধু বর্তমান প্রজন্মকে তাদের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন রাখার জন্য। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, স্বাধীনতার ঘোষণায় উল্লেখিত জাতীয় অঙ্গীকার সমূহ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র, উন্নয়ন পরিকল্পনা বা শিক্ষাসূচীর কোথাও অন্তর্ভূক্ত হয়নি। আর হয়নি বলেই আমাদের জাতীয় লক্ষ্য নিয়ে আজও বিভ্রান্তির অবসান ঘটেনি। স্বাধীনতার বিশ বৎসর পরও চলছে সরকার পদ্ধতি নিয়ে শাসনতান্ত্রিক বিতর্ক, উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহ হয়েছে চরমভাবে ব্যর্থ এবং শিক্ষাঙ্গণে বিরাজ করছে চরম হতাশা ও অস্থিরতা।

উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের মতে, জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণের ব্যাপারে যতদিন কোন জাতির মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন সে জাতির পক্ষে উন্নয়নের সঠিক পথ নির্ধারণ বা অগ্রগতির অভিযানে সামিল হওয়া সম্ভবপর হবেনা।

আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণায় উল্লেখিত 'সামাজিক ন্যায়বিচার'ই হচ্ছে আমাদের একমাত্র জাতীয় লক্ষ্য। বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতদ্বৈততা থাকলেও এই একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার এখনও সুযোগ আছে। আর জাতীয় ঐক্যই যদি জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত হয়, তাহলে এই জাতীয় লক্ষ্য অর্থাৎ 'সামাজিক ন্যায়বিচার' কে মূল কেন্দ্রবিন্দু ধরে, দেশের রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি ও শিক্ষা ইত্যাদি কর্মকান্ডকে সংগঠিত করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে জাতির মুক্তি।

স্বাধীনতার অর্ধযুগ পর ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উদ্যোগে এক শাসনতান্ত্রিক সংশোধনের মাধ্যমে 'সামাজিক ন্যায়বিচার'কে বাংলাদেশের অন্যতম রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অতএব, এ ব্যাপারে দেশের চিন্তাবিদ, গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের মহান দায়িত্ব হচ্ছে, 'সামাজিক ন্যায়বিচারের' ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর সঠিক কর্মকাঠামো নির্ধারিত করা। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে 'সামাজিক ন্যায়বিচার' সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদানের প্রচেষ্টা থাকবে।

'সামাজিক ন্যায়বিচারের' ধারণাটি প্রথম উল্লেখিত হয় হিব্রু বাইবেলে। তবে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে, গ্রীক দার্শনিক প্লেটো সর্বপ্রথম "ন্যায়বিচার"কে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেন। প্লেটোর

www.icsbook.info

মতে, সমাজে প্রত্যেককে তার ন্যায্য পাওনা প্রদান করাটাই হচ্ছে ন্যায়বিচার। কিন্তু ন্যায্য পাওনা নির্ধারণের মাপকাঠি কি হবে? এ ব্যাপারে প্লেটোর উত্তরসুরী এরিষ্টোটলের অভিমত হচ্ছে, সমাজে যার যা অবদান তার সমানুপাতিক হারে পাওনা নির্ধারণই হচ্ছে ন্যায়বিচার। এই সংজ্ঞাটি অনেকটা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সমাজে বসবাসকারীদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাদের কোন অবদান রাখার সামর্থ নেই। উদাহরণ স্বরূপ, পংগু, বৃদ্ধ, রুগ্ন ইত্যাদি। তাদের কি উপায় হবে? দ্বিতীয়তঃ, সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখার পূর্বে মানুষকে প্রথমে (বিভিন্ন মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে) অবদান রাখার পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, শুধু অবদান ভিত্তিক পাওনা নির্ধারণের ব্যবস্থায় যাদের পুঁজি, ভূমি ইত্যাদি বেশী থাকবে, তাদের হাতে ধীরে ধীরে দেশের সমুদয় উৎপাদন বা সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

অতএব, ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ বলতে এমন একটি ব্যবস্থা হওয়া উচিত যেখানে মানুষ তার অবদান ভিত্তিক বিনিময় পাবে, কিন্তু যারা অবদান রাখতে অক্ষম/অসমর্থ তাদের জন্যও সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা থাকবে এবং অপরদিকে, সমাজে সুবিধাজনক অবস্থান অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণ সমূহ নিয়ন্ত্রণের কারণে মুষ্টিমেয় ধনীদের হাতে দেশের সমুদয় সম্পদ যাতে কুক্ষিগত হতে না পারে, সে ব্যাপারেও যথাযথ ব্যবস্থা থাকবে। প্লেটো এবং এরিষ্টোটলের প্রায় এক হাজার বৎসর পর, 'সামাজিক ন্যায়বিচার' সম্পর্কে, বৈপ্লবিক ধারণা নিয়ে বিশ্বের বুকে আবির্ভূত হয়েছে ইসলাম। ইসলামী জীবন বিধান পবিত্র কুরআনে মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলছেন ঃ "ইন্নাল্লাহা য়্যামুরু বিল্ আদ্‌লে ওয়াল ইহ্‌সানে", অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মানব কল্যাণ সাধনের নির্দেশ প্রদান করেছেন (সুরা নহল ১৬ ঃ ৯০)। উল্লেখ্য যে, এই আয়াতের মাধ্যমে 'আদ্‌ল' (ন্যায়বিচার) অর্থাৎ অবদান ভিত্তিক পাওনা নিশ্চিত করার সাথে 'ইহ্‌সান' (পরোপকার) বা কল্যাণকর কর্মকেও সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে। মদীনা রাষ্ট্রে ইসলামী প্রশাসনের প্রধান হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ঘোষণা করেছেন ঃ "সমাজে যার কোন অবলম্বন নেই, রাষ্ট্রই তার অবলম্বন" (আবু দাউদ); এবং "প্রতিটি আদম সন্তানের তিনটি বিষয়ের উপর অধিকার রয়েছে– খাবার জন্য রুটি, থাকার জন্য বাসস্থান এবং পরার জন্য বস্ত্র" (তিরমিজী)। অপরদিকে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ একথাও বলেছেন যে ঃ 'কায়লা য়্যাকুনা দু'লাতাম বাইনাল আগনিয়ায়ি মিনকুম' অর্থাৎ সম্পদ যেন

www.icsbook.info

কেবল সমাজের বিত্তবানদের মধ্যেই আবর্তিত না হয় (সুরা হাশর, ৫৯ ঃ ৭)।

ইসলামে 'সামাজিক ন্যায়বিচার' একটি ব্যাপক ও সমন্বিত কর্মসূচী যেখানে আইনের প্রণয়ন ও প্রয়োগ এবং উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে সমতার ভিত্তিতে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে 'সামাজিক ন্যায়বিচারের' 'বৈশিষ্ট্যসমূহ' নিম্নরূপ ঃ

১। জনগণের দৈহিক পুষ্টি ও মানসিক বিকাশের জন্য মৌলিক চাহিদার (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা) পূরণ;

২। কর্মক্ষমদের জন্য কর্ম সংস্থান এবং কর্মে অক্ষম ও অসহায়দের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য মোচন;

৩। সমাজের স্বার্থে উৎপাদনের উপকরণ সমূহের (ভূমি, পুঁজি, শ্রম ইত্যাদি) সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টি;

৪। সমাজের মুষ্টিমেয় ধনীদের হাতে সম্পদের কুক্ষিগতকরণ রোধ এবং সম্পদের বন্টন ও পুনর্বন্টনের মাধ্যমে সমাজে ধনী ও গরীবের ব্যবধান হ্রাস;

৫। সরকার গঠন বা সমাজে কর্তৃত্ব করার (আইন ও নীতি প্রণয়ন) ক্ষেত্রে মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ;

৬। নির্ধারিত আইন ও বিধি-বিধান শাসক-শাসিত, ধনী-গরীব এবং মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগ;

৭। রাষ্ট্রীয় সেবা ও সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকলের সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ, এবং

৮। সমাজের অব্যাহত উন্নয়ন ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে সামাজিক শান্তি বজায় রাখা। এজন্য প্রয়োজন শাসক ও জনগণের আচরণকে নির্ধারিত সীমারেখার (গৃহীত শাসনতন্ত্র) মধ্যে সীমিতকরণ।[২]

ইসলামে বর্ণিত 'সামাজিক ন্যায়বিচারের' উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং এগুলির সফল বাস্তবায়ন

---

[২]ইসলামের দৃষ্টিতে 'সামাজিক ন্যায়বিচারের' বৈশিষ্ট্য সমূহের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন লেখকের, *Social Justice in Bangladesh (Chittagong: Liberty Forum, 1991)* ।

www.icsbook.info

ঘটেছিল সপ্তম শতাব্দীতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) প্রবর্তিত মদীনা রাষ্ট্রে এবং খোলাফায়ে রা'শেদুনের শাসনামলে।

'সামাজিক ন্যায়বিচার' সম্পর্কিত উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহের মধ্যে কোনটি বাংলাদেশের জন্য প্রয়োগ উপযোগী সেটি নির্ধারণ করার দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের। এটা অবশ্য অনেকাংশে নির্ভর করছে এদেশের জনগণের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও মূল্যবোধের উপর। তবে '৭০ এর নির্বাচনের প্রাক্‌কালে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক আবেদনে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে ইসলামের বিধান মতে 'সামাজিক ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেছিলেন।[৩]

'ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত ঃ

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে, গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য জ্ঞানী কিন্তু 'সৎ' ও 'নিঃস্বার্থপর' লোকের শাসন কায়েমের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কেননা, পন্ডিত অথচ সততা বিবর্জিত ধূর্ত ও স্বার্থপর শৃগালের হাতে যেমন মুরগীর তত্ত্বাবধান নিরাপদ হতে পারে না, তেমনি শিক্ষিত অথচ সততা বিবর্জিত স্বার্থপর ব্যক্তিদের হাতে দেশের শাসনভার বা সম্পদের ব্যবস্থাপনা কখনও নিরাপদ হবে না। তাই এরিষ্টোটল বলেছিলেন, মানুষ সৃষ্টির সেরা, কিন্তু 'নমোচ' (সততা) ও 'ডাইকে' (ন্যায়বোধ) বিবর্জিত মানুষ হচ্ছে সৃষ্টিকুলের মাঝে সর্বনিকৃষ্ট। মানবজাতির জীবন দর্শন পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্ মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলছেন ঃ "ইত্তাবেয়ু মাল্লা য়্যাচআলুকুম আঁজরাও ওয়াহুম মোহ্‌তাদু'ন," অর্থাৎ ন্যায়বিচার ও কল্যাণকামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় তোমরা "প্রতিদান বিমুখ" বা নিঃস্বার্থপর এবং 'সৎ" নেতাদেরকে অনুসরন কর (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ঃ ২১)।

শিক্ষা, সততা ও ন্যায়বিচার ঃ

মানুষের মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। কিন্তু শুধু সম্পদ উৎপাদনের লক্ষ্যে মানুষের মাঝে দক্ষতা সৃষ্টিই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য নয়। উৎপাদিত সম্পদ সমাজে বসবাসকারী সবার মাঝে ন্যায়ভিত্তিক

---

[৩]দেখুন, *আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষ্যে দেশবাসীর প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের আবেদন*, আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নির্বাচনী দপ্তর, ঢাকা, ১লা নভেম্বর, ১৯৭০, পৃঃ ৭।

www.icsbook.info

বিতরণের জন্য মানুষের মধ্যে সততা ও ন্যায়বোধ জাগ্রত করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শিক্ষা মানুষের মাঝে আত্মিক/মানবিক গুনাবলী বিকাশের মাধ্যমে মানুষকে পাশবিক স্তর থেকে মানবিক পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে। এজন্য গ্রীক দর্শন ও ইসলামে সমাজে নেতৃত্ব প্রদানকারীদের জন্য শিক্ষাকে অত্যাবশ্যকীয় বলে ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সক্রেটিস বলেছেন ঃ "Virtue is knowledge," অর্থাৎ সততাই হচ্ছে জ্ঞান।

অতএব, দুধের সাথে পানি মিশিয়ে শতকরা লাভের অংক শেখার কৌশল শিক্ষা নয়, বরং আমাদের মত দরিদ্র দেশে সেই শিক্ষারই প্রয়োজন খুব বেশী যে শিক্ষা মানুষের মাঝে সততা ও ন্যায়বোধ জাগ্রত করবে এবং বিশ্ব মানবতার পথ প্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ভাষায়, যে শিক্ষা মানুষকে কল্যাণকামী করবে (ইব্‌নে মাযাহ্)। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলছেনঃ উখরিয়াত লিন্নাসে" অর্থাৎ আমার খলীফা বা প্রতিনিধি হিসাবে তোমাদেরকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি মানুষের কল্যাণের জন্য (সূরা আল-ইমরান, ৩ঃ১১০)। অতএব, হে মানুষ! তোমরা পারস্পরিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার কায়েম কর এবং মানুষের কল্যাণ সাধন কর (সূরা নহল, ১৬ ঃ ৯০)। সুতরাং যেদিন থেকে আমাদের দেশে ন্যায়বিচার ও মানব কল্যাণের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল, সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার শিক্ষা প্রবর্তিত হবে, সেদিন থেকে এদেশে স্বাধীনতার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াও শুরু হবে।

www.icsbook.info

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ঃ অনুভূতি বনাম অপপ্রচার*

[১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহন করেছিলেন তখন তাদের একমাত্র অনুভূতি ছিল এদেশকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর দখল থেকে মুক্ত করা। হানাদার মুক্ত বা স্বাধীন হলে দেশ কিভাবে, কোন্ আদর্শে পরিচালিত হবে, এতসব জটিল বিষয় নিয়ে ভাববার কোন অবসর মুক্তিযোদ্ধাদের তখন ছিল না। কিন্তু আজ যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দোহাই দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আসর মাত করছেন, তাদের মধ্যে প্রথম সারির অনেকেই তখন কোনভাবেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করেননি। অতএব, জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে সুসংহত করার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করার পরিবর্তে যারা আজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শ্লোগান তুলে জাতিকে বিভাজন ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষা ও উৎপাদন কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন, তারা গণতন্ত্র ও জাতীয় অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। তাই আজ দেশপ্রেমিক সকল মহলের উচিত, জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সকল ধরনের তৎপরতাকে প্রতিহত করার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা, শান্তি ও অগ্রগতিকে নিশ্চিত করা]

একাত্তরের ২৫শে মার্চের পর, হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যারা সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। আমরা এমন এক সময় জীবনকে বাজী ধরে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলাম, যখন আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনগণকে অরক্ষিত রেখে প্রাণভয়ে সীমান্ত অভিমুখে পলায়ন করছিলেন। কিন্তু সে সময়ে কোনভাবেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি এমন অনেককেই দেখছি আজ বাংলাদেশের

---

*সৌজন্যেঃ *দৈনিক ঈশান*, চট্টগ্রাম, ২৫ ও ২৬শে মার্চ, ১৯৯২ ইংরেজী।

www.icsbook.info

রাজনৈতিক অংগণে সক্রিয় হয়েছেন। অবাক হবার বিষয় হচ্ছে, তারা আসর সরগরম করছেন 'স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি' এবং 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার' দোহাই দিয়ে। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে আজ তারা যা বলছেন বা করছেন, তার সাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসাবে আমার চিন্তা-চেতনার মধ্যে বড় ধরণের একটা ব্যবধান অনুভব করছি।

আজ আমার পরিচয় মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে নয়। আমি কোন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্যও নই। মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট দেখিয়ে কোনদিন চাকুরীতে পদোন্নতি বা ইনক্রিমেন্ট গ্রহণেও সচেষ্ট হইনি। কেননা মুক্তিযুদ্ধে আমার অংশগ্রহণটা ছিল অন্যায়ের প্রতিবাদ, দেশ মাতৃকার প্রতি মমত্ববোধ এবং দায়িত্ববোধ থেকে উৎসারিত একটা স্বতঃস্ফূর্ত ও নিঃস্বার্থ সাড়া। আজ আমার পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একজন শিক্ষাবিদ ও গবেষক হিসাবে। স্বাধীন দেশের এগার কোটি নাগরিকদের মধ্যে একজন মাত্র। আজ আমার সামনে প্রধান করণীয় হচ্ছে, জীবনপণ করে যে দেশকে স্বাধীন করেছি, কর্মের মাধ্যমে এবং শুধু কর্মের মাধ্যমে সে দেশের জনগণের কাছে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলা। কেননা জনবহুল আমাদের এই দেশটি এমন যে এর বিস্তীর্ণ কোন জমি নেই, আমাদের জমির নীচে তেলের কোন সন্ধান নেই। একমাত্র সকল মানুষের কর্মক্ষমতার উন্মোচন ছাড়া, আমাদের আর কোন উপায় নেই।[১] সাথে সাথে এটাও অনুভব করছি যে আজ যারা 'স্বাধীনতার' বিকৃত ও মনগড়া কাহিনী পরিবেশন করছেন, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র দোহাই দিয়ে যুব সমাজের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন এবং সন্ত্রাস ও অরাজকতা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, উৎপাদন কর্ম ও সামাজিক শান্তিকে বিঘ্নিত করছেন, তাদের অশুভ তৎপরতার ব্যাপারে জাতিকে সচেতন করে দেয়া প্রয়োজন। সঠিক তথ্যের উপস্থাপনা ও যথাযথ বিশ্লেষণ জাতিকে তার মূল লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। মূলতঃ এ জাতীয় অনুভূতি থেকেই বক্ষ্যমান নিবন্ধের অবতারণা।

দু'টি প্রশ্ন ঃ

লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার দেড় দশক পর অর্থাৎ আশির দশকের মাঝামাঝিতে এসে "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা" নামক স্নায়ু

---

[১] ডঃ মোঃ ইউনুস, "পরবর্তী বিশ বছরের জন্য কি প্রস্তুতি নেব" দৈনিক পূর্বকোণ, চট্টগ্রাম। ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯২ ইংরেজী।

www.icsbook.info

উত্তেজক শ্লোগানটি দেশের রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে ভয়াবহভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও তাদের সমমনা রাজনৈতিক সহযোগীরা নিজেদের অশুভ তৎপরতার সমর্থনে এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার কৌশল হিসাবে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' চেতনা' শ্লোগানটি ব্যবহার করছেন। তাদের এহেন কার্যকলাপের ফলে জাতীয় সংহতি বার বার হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে, সন্ত্রাস ও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ছে শিক্ষাঙ্গণে, শহরে, বন্দরে, গ্রামে ও গঞ্জে। বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর ভাষায়, "এভাবে বিভিন্ন চেতনার কথা শুনতে শুনতে জাতি যেন ক্রমাগত অচেতন হয়ে পড়ছে"। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' বিষয়টা আসলে কি? এরই সাথে সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় যে, প্রশ্নটি জড়িত সেটি হচ্ছে, স্বাধীনতার দেড় দশকেরও অধিককাল পর হঠাৎ করে এ জাতীয় শ্লোগান তোলার হেতুই বা কি? এভাবে জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে জাতিকে বিবাদমান শিবিরে বিভক্ত করার পেছনে কি রহস্য থাকতে পারে? বিষয়টি যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত, অতএব, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে একজন অংশগ্রহণকারী হিসাবে লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং পরবর্তীতে সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে আলোচ্য নিবন্ধে উপরোক্ত প্রশ্নদ্বয়ের জবাব প্রদানের প্রচেষ্টা থাকবে।

(দুই)

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ঃ একাত্তরের প্রেক্ষাপটে

আমাদের জাতীয় জীবনে সবচাইতে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য হচ্ছে, একটি রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষ সম্মান শ্রেণীর ছাত্র এবং (পূর্ব পাকিস্তান) ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় কর্মী। কিন্তু একাত্তরের মার্চ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার কোন প্রস্তুতি আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগের ছিল বলে আমার জানা ছিল না।

১৯৭০ এর নির্বাচনে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ৩রা মার্চ '৭১ থেকে ঢাকায় বসে ফেডারেল পাকিস্তানের জন্য

www.icsbook.info

একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কথা ছিল। নির্ধারিত ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল এবং পাকিস্তানের জন্য শাসনতন্ত্রের একটি খসড়াও প্রণয়ন করেছিল।[২]

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং পূর্ব বাংলার অবিসংবাদিত জাতীয়তাবাদী নেতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ১লা মার্চের এক বেতার ঘোষণায় ৩রা মার্চের সংসদ অধিবেশনটি পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক পিওপল্‌স পার্টির নেতা জুল্‌ফিকার আলী ভূট্টোর প্রকাশ্য চাপের কাছে নতি স্বীকার করে পিছিয়ে দেবার প্রতিবাদে, আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশব্যাপী (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে) এক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। এই আহবানে সাড়া দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা স্থগিত করে আমি পিতার কর্মস্থল কাপ্তাই প্রজেক্ট এলাকায় গমন করি। কাপ্তাইস্থ তদানীন্তন ওয়াপ্‌দা (WAPDA)

---

[২] এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন লেখকের, *Social Justice in Bangladesh, (Chittagong: Liberty Forum, 1991)*।

www.icsbook.info

কর্মচারী ইউনিয়নের সেক্রেটারী জনাব রশীদ আহ্‌মদকে আহ্‌বায়ক করে "স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদ" গঠনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত কর্মসূচীর সমর্থনে জনমত গঠনের জন্য কাপ্তাই ও আশপাশের পার্বত্য এলাকায় ব্যাপক তৎপরতা শুরু করি। কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি যে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও স্বাধীকারের দাবীতে আমাদের এই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অচিরেই এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করবে। সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সংসদীয় সংকট নিরসনকল্পে ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল (বর্তমান শেরাটন) হোটেলে আলোচনারত মুজিব-ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার বৈঠকের প্রতি। এবং তাদের এই আলোচনা অগ্রগতি লাভ করছিল বলে ২৫শে মার্চ (১৯৭১) পর্যন্ত (বঙ্গবন্ধুর উদ্ধৃতি দিয়ে) ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল।

সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল ২৫শে মার্চের গভীর রাতে। সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কাপ্তাই ও পার্শ্ববর্তী পার্বত্য এলাকায় বঙ্গবন্ধু ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে সংগ্রাম কমিটির তৎপরতা পরিচালনার পর, গভীর রাতে ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত আনুমানিক তিন ঘটিকার সময় বন্ধু হালিম ও মুজিব (উভয়েই "স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদের" সদস্য এবং কাপ্তাই সুইডিস পলিটেক্‌নিকের ছাত্রনেতা) এসে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। তাদের চোখে-মুখে উত্তেজনার ছাপ। তারা জানাল যে "বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এবং ইয়াহিয়া খানকে ঢাকায় বন্দী করা হয়েছে।" কথাটা প্রথমে অবিশ্বাস্য হলেও পরক্ষণেই মনে হল এটাইত প্রত্যাশিত। আনন্দে-উত্তেজনায় তাৎক্ষণিকভাবে তাদের সাথে বেরিয়ে পড়লাম। গভীর রাতে শ্লোগানে-শ্লোগানে পাহাড় পরিবেষ্টিত কাপ্তাই প্রজেক্ট এলাকাটি মুখরিত হয়ে উঠল। আমাদের মিছিলটি যখন "জয় বাংলা-জয় বাংলা;-"স্বাধীন হল, স্বাধীন হল, বাংলাদেশ স্বাধীন হল"-"শেখ মুজিব, শেখ মুজিব-জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ;" ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে কাপ্তাই বাঁধের মাঝামাঝি পৌঁছে, তখন রাতের প্রায় শেষ প্রহর, মসজিদের মিনার থেকে মুয়াযযিনের আজানের ধ্বনি ভেসে আসছিল। সেই মুহূর্তে আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন কাপ্তাই প্রজেক্টে ষ্টেশনরত পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল্‌স (EPR) এর ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার ক্যাপ্টেন হারুন আহমেদ চৌধুরী। তিনি ইতোমধ্যে তার উর্ধ্বতন পাঞ্জাবী মেজর সহ অবাঙ্গালী জওয়ানদের বন্দী/নিহত করে ব্যাটেলিয়নের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহন করেছেন। তিনি আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সংগঠিত

www.icsbook.info

হবার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে নিকটস্থ মুক্তিযুদ্ধের নিয়ন্ত্রন কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে দ্রুত চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হলেন।

পরদিন সকালে বি, বি, সি ও আকাশবাণীর সংবাদ বুলেটিনে জানা গেল যে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার কোন ঘোষণা দেননি এবং ইয়াহিয়া খানও গ্রেফতার হয়নি ! বরং ঘটনাটা ঠিক তার উল্টো। বঙ্গবন্ধুই বন্দী হয়েছেন পাকিস্তানী সেনাদের হাতে ! পাকিস্তানী সেনারা ২৫শে মার্চের রাতে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়েছে অরাজনৈতিক সংগঠন–পীলখানাস্থ ই, পি, আর, ক্যাম্পে এবং পলাশী ব্যারেকের পুলিশ লাইনে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস ও শিক্ষকদের কোয়ার্টারে। একদিকে পাকিস্তান বেতারে জাতীয় সংহতি রক্ষার নামে সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ এবং অপরদিকে, মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী সংবাদ– রীতিমত একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি। এভাবে অপ্রস্তুত ও অসংগঠিত অবস্থায় পড়ার জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতাই দায়ী বলে মনে হল। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, জনগণের ব্যালটের রায়কে বুলেটের মাধ্যমে নস্যাৎ করার অপচেষ্টার ফলশ্রুতিতে, সংযুক্ত পাকিস্তানের ইতি হয়েছে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের হঠকারিতা এবং বিশেষতঃ জনগণের সাথে প্রতরণা বা বিশ্বাস ভংগের কারণে পঁচিশ বৎসরব্যাপী আমাদের অর্থে গড়া পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী যাদেরকে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী ভেবে এতদিন অহংকারবোধ করেছি, তারাই হল আজ আমাদের ঘাতক! এভাবে আশাভংগ, বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে প্রথমদিন অর্থাৎ ২৬শে মার্চ অতিক্রান্ত হল।

২৭শে মার্চ হঠাৎ প্রতিবেশীর রেডিওতে ভেসে এল অষ্টম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালী অফিসার মেজর জিয়ার এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। যতদুর মনে পড়ে, ইংরেজী ভাষায় প্রচারিত মেজর জিয়া তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেছিলেন। বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের উপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ এবং তাদের ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ থেকে অসহায় নর–নারীদের রক্ষা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সহযোগিতার আবেদনই ছিল মেজর জিয়ার ভাষণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আজও মনে পড়ে, চট্টগ্রাম বেতার থেকে প্রচারিত মেজর জিয়ার সেই তেজদৃপ্ত কণ্ঠস্বর দেশবাসীর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কি অভূতপূর্ব সাহস ও অনুপ্রেরণাই না সঞ্চার করেছিল।

www.icsbook.info

বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক
৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান

পার্বত্য চট্টগ্রামের তদানীন্তন জেলা প্রশাসক জনাব হাছান তৌফিক ঈমাম মুক্তিযুদ্ধের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। সম্ভবতঃ উর্ধ্বতন সরকারী আমলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম পাকিস্তান সরকারের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং কলকাতাস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনার জনাব হোসেন আলীও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছিলেন। সেদিন তাদের এই সাহসী পদক্ষেপ দেশবাসীর মধ্যে সৃষ্টি করেছিল বিপুল উদ্দীপনা, মনে সঞ্চার করেছিল দৃঢ় প্রত্যয়। তখনও কিন্তু আমরা সত্তর এর নির্বাচনে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছ থেকে কোন নির্দেশনা পাইনি। তাদের উপর আস্থাজ্ঞাপনকারী নিরীহ জনগণকে হানাদার বাহিনীর হিংস্রতার মুখে অরক্ষিত রেখে তাঁরা তখন আত্মরক্ষার্থে সীমান্ত অভিমুখে দৌড় প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। রাঙ্গামাটির তদানীন্তন এস,ডি,ও, অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রাগার থেকে বেশ কিছু অস্ত্র সরবরাহ করেছিলেন। পরবর্তীকালে রাঙ্গামাটি দখলের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে তাঁকে হত্যা করেছিল।

www.icsbook.info

কাপ্তাই প্রজেক্টে আমরা প্রায় ২৫০ জনের মত মিলিটারী ট্রেনিংপ্রাপ্ত মোজাহিদ ছিলাম। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরপরই, পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর উৎকণ্ঠা প্রকাশের কারণে, পাকিস্তান সরকার এক বিশেষ কর্মসূচীর মাধ্যমে তরুণদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করেছিল। সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আমাদের সবাইকে মার্চ মাসের শেষের দিকে ৩০৩ রাইফেল সরবরাহ করা হল এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক প্রশিক্ষকদের সাহায্যে কাপ্তাই স্কুল ময়দানে পুনরায় অস্ত্র চালানোর ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা হল। ইতিমধ্যে ভারতের মীজুরাম থেকে বেশ কিছু মীজু গেরিলাও আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। যে বিদ্রোহী মীজুরা পাকিস্তানের সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় সেনাদের সাথে যুদ্ধ করছিল, তারা কিভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এল বিষয়টা আজও রহস্যাবৃত হয়ে আছে। দুঃখজনক স্মৃতি হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সপ্তাহে কাপ্তাইয়ে নিরীহ অবাংগালী (বিহারী ও পাঠান) নিধনের যে নিষ্ঠুর মহড়া প্রত্যক্ষ করেছি, তা রীতিমত বীভৎস ও লোম শিহরণকারী। অবাংগালীদের ঘর, সম্পত্তি এবং চাকুরীর পদ দখলের লোভে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে কোনভাবেই জড়িত নয় এমন বাংগালীদেরকে দেখেছি অতি উৎসাহে নিরীহ ও নিরস্ত্র অবাংগালীদেরকে নিষ্ঠুরভাবে কুপিয়ে হত্যা করতে। এই পৈশাচিক দৃশ্যের অপর এক সাক্ষী শ্রী রণজিত বিশ্বাস একাত্তরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেনঃ "মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে আমি আমার শৈশবের শুরু কাপ্তাইতে নির্বিচারে মানব নিধন দেখেছি। যারা হত্যা করছিল তারা এবং হত্যায় যারা ব্যতিত হয়েছিল তারা ধরেই নিয়েছিল- অবাঙ্গালীরা মানুষ নয়" (*দৈনিক আজকের কাগজ*, ঢাকা, ৯ই জানুয়ারী, ১৯৯৩ ইংরেজী)। শুনেছি একই সময়ে চন্দ্রগোনা পেপার মিল এলাকায় বসবাসকারী বহু অবাংগালী নারী-পুরুষের উপরও এভাবে নিধনযজ্ঞ চালান হয়েছিল। এ সকল হতভাগ্য মানুষের নিষ্ঠুর ও অহেতুক বলিদানের কাহিনী মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে কোনদিন হয়ত লিখা হবে না। শহীদ হিসাবে কেউ জানাবেনা তাদেরকে শ্রদ্ধাঞ্জলী। আমরাও কোনদিন জানতে পারবনা এভাবে কত নিরপরাধ নারী-পুরুষকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের হঠকারিতামূলক সিদ্ধান্তের কারণে।

আমি যতদুর পেরেছি বংগবন্ধুর ৭ই মার্চের বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়ে এজাতীয় কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে সংযত করার চেষ্টা

www.icsbook.info

করেছি, কেননা সাম্প্রদায়িক হানাহানির কারণে আমাদের সংগ্রাম মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়তে পারে। মনে পড়ে, কোথাও কোথাও রাইফেলের ব্যায়নেট উঁচিয়ে হিংস্র মানব হন্তাদের বিরত করেছিলাম।

আমাদের মধ্যে যাদের সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল না তাদেরকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য ভারতীয় সীমান্তের দিকে পাঠান হল। এদের দলে বন্ধু হালিম, মুজিব, জাহাংগীর, মহিউদ্দিন (পরবর্তীতে সামরিক বাহিনীর মেজর) এবং আমার বড় ভাই গোলাম মোস্তফা চৌধুরী ছিলেন। ৫ই এপ্রিল (১৯৭১) আমার উপর দায়িত্ব বর্তাল সংগৃহীত কিছু ৩০৩ রাইফেল ও ৬০.৭৫ এম. এম. মর্টার গোপনে মেজর জিয়ার নেতৃত্বাধীন কালুরঘাট সামরিক ক্যাম্পে পৌঁছিয়ে দেবার। পরদিন সকালে অশ্রুসজল নয়নে বাবা-মা এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অস্ত্রভর্তি WAPDA এর একটি পিক্‌আপ নিয়ে গন্তব্য পথে রওয়ানা হই। আমাদের পিক্‌আপটি চন্দ্রঘোনা থেকে ফেরীযোগে কর্ণফুলী নদী পেরিয়ে পাহাড়ী পথে বান্দরবান হয়ে সন্ধ্যার পর কালুরঘাট ক্যাম্পে পৌঁছে। যতদূর মনে পড়ে, পিক্‌আপের ড্রাইভার ছাড়াও এই যাত্রায় আমার সহযাত্রী ছিলেন স্বাধীন-বাংলা বেতারের প্রকৌশলী জনাব আমিনুর রহমান। কালুরঘাটে দেখা হল মেজর (পরবর্তীতে লেঃ জেনারেল) মীর শওকত আলী, ক্যাপ্টেন (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) হারুন আহমেদ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন খালিকুজ্জামান (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার) ও লেঃ শামসুল মোমিন শম্‌শের (পরবর্তীতে কর্ণেল) এর সাথে। আরও দেখা হল মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী তিনজন চট্টগ্রাম কলেজের প্রাক্তন সহপাঠীর। এরা ছিলেন (মোটা) শওকত (পরবর্তীতে সামরিক বাহিনীর মেজর), (পাত্‌লা) শওকত (বর্তমান কানাডায় ব্যবসারত) এবং ফারুক (পরবর্তীতে সামরিক বাহিনীর মেজর)। ছাত্রজীবনে এদেরকে কখনও রাজনীতি করতে দেখিনি অথচ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে এরাই এগিয়ে এসেছে সবাইর আগে জীবনকে বাজী রেখে। সেদিন রাজনীতি ও দেশপ্রেমের সংজ্ঞা পুনঃ নির্ধারণের প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম। পটিয়া থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগের অধ্যাপক নূরুল ইসলামের সাথেও দেখা হয়েছিল একবার। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হাতে কালুরঘাটের পতন ঘটেছিল সম্ভবতঃ ১২ই এপ্রিল (১৯৭১)। সকাল হতেই পাকিস্থানী সেনাবাহিনীর ভারী আর্টিলারী আক্রমনের সামনে হাল্কা অস্ত্র নিয়ে বাংগালী সৈন্যদের বেশীক্ষণ টিকে থাকা সম্ভবপর হলনা। তারা পিছু হটতে বাধ্য হল। কিন্তু ইতোমধ্যে ক্যাপ্টেন হারুন গুরুতরভাবে আহত হলেন এবং লেঃ শম্‌শের আহত অবস্থায় পাক সেনাদের হাতে বন্দী হলেন। এরপরও কিন্তু আমি পটিয়া ছাড়িনি। আশ্রয় নিয়েছিলাম চিকন কাজী পাড়ার

www.icsbook.info

জনৈক মন্নান ড্রাইভারের বাড়ীতে। পটিয়া থেকেই সংবাদ পেয়েছি যে, পাকিস্তানী আর্মিরা কাপ্তাইয়ের প্রজেক্ট ম্যানেজার প্রকৌশলী জনাব সামসুদ্দিন আহমেদকে হত্যা করেছে এবং মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অংশগ্রহণের খবর জানতে পেরে অগ্নিসংযোগ করে আমার বাবার অফিসিয়াল কোয়ার্টারটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে দিয়েছে। বাসায় বাবা-মা ও ছোট ভাই-বোনদের রেখে এসেছিলাম, তাদের কি হল? তারা বেঁচে আছে কিনা জানার জন্য উদ্বেগ ও আশংকায় মনটা অস্থির হয়ে উঠল। আরও শংকাবোধ করলাম একারণে যে, মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে বাংগালীদের হাতে নিহত অবাংগালীদের পরিবার পরিজন পাকিস্তানী সেনাদের সহযোগিতায় বাংগালীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠতে পারে, একথা ভেবে।

বাবা-মা-ভাই-বোন বেঁচে থাকুক আর নাই থাকুক, দেশের মুক্তিযুদ্ধে যেভাবে জড়িয়ে পড়েছি, দেশ হানাদার মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ছাত্র জীবনে আর ফিরে যাবনা বলে মনে মনে শপথ গ্রহণ করলাম। দেশকে হানাদারমুক্ত এবং স্বাধীন করব-এটাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের একমাত্র চেতনা। পাকিস্তান আর্মির নিপীড়ণ যতই বাড়তে থাকল, মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা এবং এতে জাতির অংশগ্রহণ ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল। ধীরে ধীরে আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির সাথে পুরা জাতীয় চেতনা সম্পৃক্ত হয়ে পড়ল।

(তিন)

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাঃ অনুভূতি

আলোচ্য প্রবন্ধটি যেহেতু রচিত হয়েছে "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা"কে ঘিরে, সেহেতু উপরোক্ত ভূমিকাটি বিবৃত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির প্রেক্ষাপট হিসাবে। আলোচ্য প্রবন্ধে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' প্রত্যয়টিকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছেঃ

(ক) ব্যক্তিগত অনুভূতি;

(খ) যৌক্তিক উপস্থাপনা; এবং

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাখ্যা।

www.icsbook.info

ক) মুক্তিযুদ্ধের চেতনাঃ ব্যক্তিগত অনুভূতি ঃ

মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক চেতনা হচ্ছে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত অনুভূতি। একাত্তর সালে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের একমাত্র অনুভূতি ছিল এদেশকে (পাকিস্তানী) হানাদার বাহিনীর দখল থেকে মুক্ত করা, অর্থাৎ এদেশকে স্বাধীন করা। এর কম বা বেশী কোন প্রত্যাশা সেদিন তাদের ছিল না। হানাদারমুক্ত বা স্বাধীন হলে দেশ কিভাবে পরিচালিত হবে, কারা দেশ চালাবেন বা কোন্ আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে ইত্যাদি জটিল বিষয় নিয়ে ভাববার কোন অবসর মুক্তিযোদ্ধাদের তখন ছিল না। অতএব, আজ যারা বিভিন্ন কাল্পনিক স্বপ্ন বা আদর্শের কথা বলছেন, তাদের বক্তব্যের সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ বা ভিত্তি নেই।

খ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনাঃ যৌক্তিক উপস্থাপনা ঃ

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরবর্তী ব্যাখ্যাটা অনেকটা লজিক্যাল বা যৌক্তিক। এটা শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও গবেষকদের আলোচ্য বিষয়। সম্পূর্ণ আলোচনাটা কেন সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল সে প্রশ্নটাকে ঘিরে। এর যৌক্তিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে সামরিক শাসন অবসানের ব্যাপারে দেয়া অংগীকার ভংগের কারণে শুরু হয়েছিল প্রথমে প্রতিবাদ ও অসহযোগ আন্দোলন, যার সর্বশেষ পরিণতি ঘটেছিল সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে। অতএব, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যৌক্তিক অর্থ হচ্ছে, একটি গণপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার বা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা যার মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার, পূরণ হবে তাদের প্রত্যাশা।

গ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ঃ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাখ্যা ঃ

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সর্বশেষ ব্যাখ্যাটি হচ্ছে, জনগণের প্রতি ঘোষিত স্বাধীনতার অংগীকার পালন। প্রাথমিকভাবে কিছুটা অসংগঠিত হলেও, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছিল ১৭ই এপ্রিল প্রবাসী মুজিবনগর (বাংলাদেশ) সরকার গঠনের মাধ্যমে। মুজিবনগর সরকারটি গঠিত হয়েছিল ১০ই এপ্রিল ঘোষিত স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণাটিকে কার্যকর করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনার জন্য। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে সত্তর এর নির্বাচনে

www.icsbook.info

(আওয়ামী লীগ টিকেটে) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ দ্রুত একত্রিত হয়ে কুষ্টিয়ার আম্রকাননে নিম্নোক্ত স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রদান করেছিলেনঃ

"বাংলাদেশের জনগণ (১৯৭০ এর নির্বাচনে) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যেই ম্যান্ডেট প্রদান করিয়াছে সেই ম্যান্ডেট অনুয়ায়ী আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আমাদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্যে ***'সাম্য' 'মানবিক মর্যাদা' ও 'সামাজিক ন্যায়বিচার'*** *প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার ঘোষণা প্রদান করিতেছি"।* [৩]

স্বাধীনতার বিশ বৎসর পর আজও যারা স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে বিতর্ক করছেন তাদের উদ্দেশ্যে একথাই বলা চলে যে, একাত্তরে বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধটি ছিল ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের একটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কারও ঘোষণার অপেক্ষায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ থেমে থাকেনি। বিতর্ককারীদের জন্য এটাই যথেষ্ট যে স্বাধীনতার ঘোষণা একমাত্র তিনি বা তারাই দিতে পারেন যিনি বা যারা জনগণের পক্ষ হয়ে কথা বলার জন্য বৈধ কর্তৃত্বের অধিকারী। এভাবে জনগণের পক্ষে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন বংগবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সত্তর এর নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ। তাইত চট্টগ্রাম বেতার থেকে ২৭শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান বংগবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রদান করেছিলেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পর, স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্ক অর্থহীন। স্বাধীনতা উত্তরকালে আমাদের কর্মকান্ড আবর্তিত হওয়া উচিৎ কি জাতীয় লক্ষ্য বা অঙ্গীকার নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে সেই মৌলিক প্রশ্নটিকে ঘিরে।

অতএব, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' বলতে বুঝায় স্বাধীনতার অঙ্গীকার অর্থাৎ স্বাধীনতার ঘোষণায় উল্লেখিত "সাম্য", "মানবিক মর্যাদা" ও "সামাজিক ন্যায় বিচার"। এসবই হচ্ছে স্বাধীনতার মূল্যবোধ। এর প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে আমাদের উপর প্রায় দু'শ বছরব্যাপী বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ এবং পুনরায় ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ২৩ বৎসরব্যাপী পাকিস্তানী শাসনামলে আমাদের প্রতি অসম আচরণ, অমর্যাদা এবং সামাজিক অবিচার বা বঞ্চনা। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী নিজেদেরকে সব

৩ হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনত যুদ্ধঃ দলিল পত্র*, তৃতীয় খন্ড, ঢাকা- ১৯৮২

www.icsbook.info

সময় প্রভু ভেবেছে। সরকার পরিচালনায় আমাদেরকে কখনও তাদের সমান ভাবেননি, আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা দিতে চায়নি এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণে ও জাতীয় সম্পদ বন্টনে আমাদের প্রতি ন্যায়বিচার করেনি! তাই এ জাতীয় পরাধীনতার গ্লানিকর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণায় উল্লেখিত হয়েছে মানুষে মানুষে সাম্য বা সমানাধিকার, মানুষের প্রতি মানুষের মর্যাদাবোধ এবং সামাজিক সম্পর্ক বা লেন-দেনের ক্ষেত্রে যার যা প্রাপ্য তাকে তা প্রদান বা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, লক্ষ শহীদের রক্তে রঞ্জিত স্বাধীনতার ঘোষণায় উল্লেখিত অংগীকার, "সাম্য", "মানবিক মর্যাদা" ও "সামাজিক ন্যায়বিচার" স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে স্বীকৃতি পায়নি! কেন এবং কোন্ প্রভাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অনুকরণে আমাদের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে জুড়ে দেয়া হয়েছিল "সমাজতন্ত্র", "ধর্মনিরপেক্ষতা" ইত্যাদি বিতর্কিত প্রত্যয়, সেটাই আজ শাসনতন্ত্র প্রণেতাদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য? স্বাধীনতার ঘোষণাটিকে অস্বীকার করে, স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বদলে একদলীয় ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন প্রবর্তণ করে এবং পরবর্তীকালে সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতার স্বার্থে ব্যবহার করে, কারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনামূলে বারবার আঘাত হেনেছে, সেটাই হওয়া উচিৎ আজকের প্রজন্মের বিচার্য বিষয়।

(চার)

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাঃ অপপ্রচার ও স্বরূপ উন্মোচনঃ

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, স্বাধীনতার প্রথম দশক অর্থাৎ বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনকালে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' জাতীয় কোন শ্লোগান বা বক্তব্য শোনা যায়নি। কেন আশির দশকের মাঝামাঝিতে এসে হঠাৎ করে একদল বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, ছাত্রনেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ' ও 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' ইত্যাদি শ্লোগানে সোচ্চার হলেন? এরা 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র নামে এমন কিছু করছেন যা কোনক্রমেই মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট প্রতিফলিত করে না। মুক্তিযুদ্ধের এ সকল তথাকথিত চেতনাধারীরা 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার' নামে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদেরকে ঢালাওভাবে

www.icsbook.info

স্বাধীনতা বিরোধী বলে আখ্যায়িত করছেন; ইসলামকে মৌলবাদ বলে অপবাদ দিচ্ছেন; মাঝে মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি করে দাড়ি-টুপি পরিহিত লোকজনদের অপমান করছেন; জাতীয় অনুষ্ঠানগুলিতে অভিন্ন বাঙালী সংস্কৃতি চর্চার নামে 'শাঁখ বাজিয়ে' ও 'মংগল প্রদীপ' জ্বালিয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতি চর্চার পথ প্রশস্ত করছেন; আমাদের ভাষায় প্রচলিত শব্দের স্থলে পর সংস্কৃতি থেকে ধার করা নতুন নতুন শব্দ প্রবর্তন করছেন এবং বিভিন্ন ইস্যুতে জাতিকে বার বার বিভক্ত ও বিবদমান শিবিরে বিভক্ত করছেন। এসবের উদ্দেশ্য কি? কাদের স্বার্থে বা প্ররোচনায় এসব হচ্ছে? একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সাথে এসবের সম্পর্ক কি?

অপরদিকে, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' শ্লোগানের মাধ্যমে সমাজে উত্তেজনা সৃষ্টির ছত্রছায়ায় এক শ্রেনীর সেনবাবু-দাসবাবুদের বাড়াবাড়িও লক্ষ্যণীয়।[৪]

এ সকল সেনবাবু-দাসবাবুদের সাম্প্রদায়িকতা, শোষণ ও নির্যাতনমুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক ও স্বাধীন পরিবেশে জীবন যাপনের প্রত্যাশায় এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ (আমাদের পূর্ব পুরুষগণ) পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন চল্লিশের দশকের মাঝামাঝিতে। তখন কিন্তু সেনবাবু-দাসবাবুরা তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণ ইসলাম ধর্মের উদার দৃষ্টিভংগী নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধীতাকারী এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে ভাই হিসাবে বরণ করে নিয়েছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতার জন্য কোনভাবেই তাদেরকে তিরস্কৃত করেনি। এমনকি, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্র এলাকার অনগ্রসর মুসলমানদের উন্নয়নের জন্য বিশের দশকে ঢাকার বুকে একটি বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের বিরুদ্ধে পর্যন্ত হিন্দুরা আন্দোলন করেছিলেন। পূর্ব বংগের বিশিষ্ট আইনবিদ বাবু আনন্দ চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে দুইশত গণ্যমান্য হিন্দু ঢাকা

---

[৪]সম্প্রতি ডঃ অনুপম সেনের অনুপ্রেরনায় এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের নামে এদেশের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ বক্তব্য সবলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। এর প্রত্যুত্তরে এডভোকেট বদিউল আলম, *'বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়'*, নামে অপর একটি পুস্তিকা ছেপেছেন।

www.icsbook.info

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ১৮ বার স্মারকলিপি সহকারে বাংলার তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ এর সাথে দেখা করেছিলেন।[৫]

অত্র এলাকার মুসলমানগণ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করুক, এটা বংগের হিন্দুরা মনে-প্রাণে চায়নি। ১৯১২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী ডঃ রাশবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে হিন্দু আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনাকালে Lord Harding বলেছিলেন, "বৃটিশ সরকারের ইচ্ছা যে ঢাকায় যে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হবে সেটি সবাইর জন্য উন্মুক্ত থাকবে-এটি হবে একটি শিক্ষাদানকারী ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়"। হিন্দুরা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে "মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়" হিসাবে পরিহাস করেছিলেন। কিন্তু এর-পরও ১৯২১ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন প্রথমদিকে নিয়োগকৃত ৬০ জন শিক্ষকের মধ্যে মুষ্টিমেয় দু'একজন বাদে, প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু শিক্ষক। মুসলমানগণ কখনও হিন্দু শিক্ষক নিয়োগের বিরোধিতা করেনি।

কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র নামে "জিন্নাহ্ হলের" নামকরণ হল "সূর্যসেন হল", "ধর্মনিপেক্ষতা"র নামে "সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল"থেকে "মুসলিম" শব্দটি বাদ দিয়ে সবাইর জন্য অবারিত করা হল, কিন্তু "জগন্নাথ হলকে" শুধু হিন্দুদের জন্য রিজার্ভ রাখা হল। অনুরূপভাবে, "জাহাংগীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়" এবং "কবি নজরুল ইসলাম কলেজ" থেকে "মুসলিম" শব্দটি বাদ দেয়া হল। এসকল ঘটনা এদেশের মুসলমানদের মনে সাতচল্লিশ এর ভারত বিভাগ পূর্ব দিনের পরিস্থিতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে "বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়" থাকতে পারলে বাংলাদেশে "জাহাংগীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়" থাকতে পারবেনা কেন? এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ধর্মানুভূতিতে সবচাইতে অসহনীয় আঘাতটি এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে "ইক্‌রা বিস্‌মে রাব্বিকাল্লাজি খালাক" অর্থাৎ "পড় তোমার প্রভূর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন" শীর্ষক কোরআন শরীফের বিশ্বজনীন বাণীটি

---

[৫]বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Pakistan Historical Society, *A History of Freedom Movement, Vol. IV, 1970, pp. 10-11.*

www.icsbook.info

বাদ দিয়ে তদস্থলে বাবু সংস্কৃতির প্রভাবাধীন 'মংগল প্রদীপ' বসানোর ঘটনায়। (চিত্রে দেখুন)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে রদবদল

স্বাধীনতার পূর্বে

স্বাধীনতার পরে

সারকথাঃ

দীর্ঘদিনের সংগ্রাম ও এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ এবং জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য আজ যখন সবাইর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন, তখন একদল দেশে উৎপাদনমুখী তৎপরতার পরিবর্তে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র দোহাই দিয়ে জাতিগত বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজকে অস্থিতিশীল করার ব্যাপারে তৎপর হয়েছেন। এর পেছনে কি রহস্য থাকতে পারে? এর উত্তর পাওয়া যাবে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের ঠিক পরের দিন অর্থাৎ ৭ই ডিসেম্বর (১৯৯০) প্রকাশিত *সাপ্তাহিক বিচিত্রার* বিশেষ বুলেটিনে মুদ্রিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গোপন সার্কুলারটিতে, যেখানে ছাত্র-জনতার ঐক্যে ভাংগন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে "বাংগালী বনাম বাংলাদেশী", "জয় বাংলা বনাম বাংলাদেশ জিন্দাবাদ", "স্বাধীনতার পক্ষের ও বিপক্ষের শক্তি", এবং "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও চেতনা বিরোধী" ইত্যাদি শ্লোগান কেন্দ্রিক বিরোধ উস্কে দেয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।[৬]

---

[৬]দেখুন "স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেই গোপন সার্কুলার" *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৯০ ইংরেজী।

www.icsbook.info

এ জাতীয় ষড়যন্ত্র মূলক ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় সমাজ বিজ্ঞানী ডঃ বোরহান উদ্দিন খান জাহাংগীরের নিম্নোক্ত বক্তব্যে, "উপনিবেশিকোত্তর বাংলাদেশে শ্রেণী নির্যাতন অব্যাহত রাখার জন্য শাসক-প্রভু গোষ্ঠী বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, জাতির পিতা, দ্বিতীয় বিপ্লব....(ইত্যাদি) মতবাদ তৈরী ও প্রচার করছে"।[৭]

১৯৮১ সালের মে মাসে একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা'র সহযোগিতায় বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক ও জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যার মাধ্যমে স্বৈরাচারী এরশাদ অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা দখলের পর থেকেই মূলতঃ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারীরা দেশব্যাপী তৎপর হয়ে উঠেছেন। এরশাদ তার অপশাসনের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে সুকৌশলে তার রাজনৈতিক এজেন্টদের সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ ইত্যাদি বিভাজনমূলক শ্লোগান তুলে জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত ও বিবদমান শিবিরে বিভক্ত করার মাধ্যমে, দোর্দণ্ড প্রতাপে সুদীর্ঘ আটটি বৎসর শাসনের নামে শোষণ ও লুণ্ঠন কর্ম চালিয়েছেন। কিন্তু এসবের উর্ধ্বে উঠে জাতি যখন নব্বইয়ের আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হল, তখনই স্বৈরাচারের পতন ঘটল। অতএব, জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে সুসংহত করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করার পরিবর্তে যারা আজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শ্লোগান তুলে জাতিকে বিভাজন ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষা ও উৎপাদন কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন, তারাই স্বৈরাচারের দোসর ও জাতীয় অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। এ ব্যাপারে মুক্তিযুদ্ধের ৫ম সেক্টরের কমান্ডার এবং ঢাকা মহানগর বি, এন, পি. এর আহ্বায়ক লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলীর একটি বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কোন ব্যক্তি বা দলের একক কৃতিত্ব নয়। একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে সবখানেই দেশের আপামর সাধারণ মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে পেয়েছি। এখন মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা বিতর্ক সৃষ্টি করে জাতিকে বিভক্ত করার

---

[৭]দেখুন লেখকের "বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন" *রাষ্ট্রবিজ্ঞান জার্নাল*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪, পৃঃ ২৪-২৫।

www.icsbook.info

চেষ্টা করা হচ্ছে।[৮] একথাটিকে আরও স্পষ্ট করে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। সম্প্রতি কিশোরগঞ্জের এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালে তিনি বলেন 'যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে তারা গণতন্ত্রকে নস্যাৎ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডকে ব্যাহত করার লক্ষ্যে বিদেশী প্রভুদের যোগসাজোসে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত'।[৯]

অতএব, আজ দেশেপ্রেমিক সকল মহলের উচিত এ সকল জাতীয় স্বার্থ বিরোদী তৎপরতাকে প্রতিহত করার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা, শান্তি ও অগ্রগতিকে নিশ্চিত করা। এ ব্যাপরে একটি বিষয় উল্লেখ না করলে এ লিখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তা হচ্ছে, যারা আজ 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র দোহাই দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আসর মাত করছেন, তাদের মধ্যে প্রথম সারির অনেক নেতাকেই জানি যারা ১৯৭১ সালে কোনভাবেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। বরং তাদের কেউ কেউ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সমর্থনে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন, বিশ্বস্ততার সাথে চাকুরী করেছেন, সরকারের পক্ষ হয়ে পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, রেডিও-টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ করে খুনী টিক্কা খান প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তাদের এ সকল কর্মকান্ড কোনভাবেই মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক ছিল না, বরং বিরোধীই ছিল।

---

[৮]বিগত ৯ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ ইংরেজী রাজধানীর উত্তরায় আশকোনা বাজারে অনুষ্ঠিত ঢাকা মহানগর বিএনপি আয়োজিত জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী উপরোক্ত কথাগুলি বরেন। দেখুন, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ ইংরেজী। আরও দেখুন বিগত ২৩শে নভেম্বর, ১৯৯২ ইংরেজী মেজর এম, এ, জলিলের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত স্মরণ সভায় প্রদত্ত লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলীর বক্তব্য, *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ২৪শে নভেম্বর, ১৯৯২ ইংরেজী।

[৯]বিগত ১৫ই নভেম্বর (১৯৯২) কিশোরগঞ্জের কোটিয়াদী পাইলট হাই স্কুল মাঠে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৯২ ইংরেজী।

www.icsbook.info

বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ঃ ঐক্য বনাম বিভাজন

[ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীকারের দাবী থেকে স্বাধীনতা অর্জন, আমাদের এই দীর্ঘ সংগ্রামী অভিযাত্রায় তিনটি কেন্দ্রীয় চেতনা আমাদের জাতীয় জীবনে সাফল্যের নির্ণায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। এগুলি হচ্ছেঃ ১) অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ; ২) জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী; এবং ৩) জাতীয় ঐক্য। এসবই হচ্ছে আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সাফল্যের মূলেও ছিল এসকল চেতনা। এবং এগুলিই হবে আগামী দিনে আমাদের জাতীয় উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি। অতএব, বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্নিহিত দাবী অর্থাৎ ন্যায়বিচার বা জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সফল করতে হলে, আজ আমাদেরকে যে কোন মূল্যে আমাদের "জাতীয় ঐক্য"কে অক্ষুন্ন রাখতে হবে। সাথে সাথে, জাতিকে বিভাজনকারী "পুরোহিত তন্ত্রের" সকল ধরণের অশুভ তৎপরতাকে নস্যাৎ করার মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে নিশ্চিত করার ব্যাপারেও আমাদেরকে সক্রিয় হতে হবে]

আমাদের জাতীয় জীবনে সর্বাধিক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হচ্ছে একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধ। আর এই স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল আটচল্লিশ–বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। সমকালীন ইতিহাসে বাংলাদেশই সম্ভবতঃ একমাত্র দেশ যার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণামূলে নিহিত ছিল মাতৃভাষা আন্দোলনের সুমহান ঐতিহ্য।

ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা ঃ

মুক্তিযুদ্ধের যেমন প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল মহান ভাষা আন্দোলনে, তেমনি ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা পরবর্তীতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে জাতিকে

www.icsbook.info

সফলতার দুয়ারে পৌঁছতে সাহায্য করেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, কি সেই মহান ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা যা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের লড়াইয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল? বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনটি ছিল মূলতঃ একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংগ্রামী প্রক্রিয়া। আমাদের জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা হচ্ছে মূলতঃ তিনটি ঃ *(১) প্রতিবাদ; (২) জনগণের ন্যায়সংগত অধিকারের দাবী;* এবং *(৩) জাতীয় ঐক্য।*

১। একুশের প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে, 'প্রতিবাদ'– অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সংশ্লিষ্ট জনগণের সাথে আলাপ– আলোচনা ব্যতিরেকে একতরফাভাবে কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সর্বোপরি, সব ধরণের অন্যায়, অবিচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছে মহান ভাষা আন্দোলন।

২। ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় শিক্ষা হচ্ছে, ন্যায়বিচার বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

৩। ভাষা আন্দোলনের তৃতীয় শিক্ষাটি হচ্ছে, জাতীয় ঐক্য। মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল পুরা জাতি। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশা, ধর্ম, দল ও মতাবলম্বীদের মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। সেই চেতনাই পরবর্তীকালে আমাদের মাঝে জন্ম নিয়েছিল একটি আলাদা জাতিসত্ত্বার।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ঃ

প্রতিবাদ, ন্যায়সংগত অধিকারের দাবী ও জাতীয় ঐক্য–ভাষা আন্দোলনের এই তিনটি শিক্ষা আমাদের জাতিসত্ত্বাকে দিয়েছিল তিনটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও দিকদর্শন। এরই ফলশ্রুতিতে সম্ভব হয়েছিল বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অর্জন। অনুরূপভাবে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধটি শুরু হয়েছিল সত্তর এর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৩রা মার্চ থেকে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য সংসদ অধিবেশনটি স্থগিত করার ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের স্বেচ্ছাচারিতামূলক ও হঠকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রথমে প্রতিবাদ ও অসহযোগ আন্দোলন, পরবর্তীতে ২৫শে মার্চের পর হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রয়াস এবং সর্বশেষে, প্রবাসী মুজিবনগর সরকার কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণায় (১০ই এপ্রিল, ১৯৭১) "সামাজিক ন্যায়বিচার" প্রতিষ্ঠার অংগীকারের মাধ্যমে। অতএব, ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীকারের দাবী থেকে স্বাধীনতা অর্জন– আমাদের এই দীর্ঘ সংগ্রামী অভিযাত্রায় তিনটি কেন্দ্রীয় চেতনা আমাদের জাতীয় জীবনে সাফল্যের নির্ণায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। এগুলি

www.icsbook.info

হচ্ছেঃ (১) অন্যায়ের বিরুদ্ধে 'প্রতিবাদ', (২) 'ন্যায়বিচারের' দাবী; এবং (৩) জাতীয় সাফল্যের অপরিহার্য পূর্বশর্ত 'জাতীয় ঐক্য'। এসবই হচ্ছে আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সাফল্যের মূলেও ছিল এসকল চেতনা। এবং এগুলিই হবে আগামীদিনে আমাদের জাতীয় উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি।

বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, বাংলা এর রাষ্ট্রভাষা এবং একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। কিন্তু স্বাধীনতার দুই দশক পরও ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য 'সামাজিক ন্যায়বিচার' অর্থাৎ অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর মৌলিক মানবিক চাহিদার পূরণ সম্ভবপর হয়নি। সাংবিধানিকভাবে জাতি জনগণের মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা) পূরণের ব্যাপারে অংগীকারাবদ্ধ হলেও (অনুচ্ছেদ ১৫), দেশের ৮৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী আজও দারিদ্র্যসীমার নীচে মানবেতর পর্যায়ে জীবন যাপন করছে, শতকরা ৭৭ জন এখনও নিরক্ষর, তিন কোটিরও অধিক লোক কর্মহীন। দেশব্যাপী উৎপাদনহীনতা, অপুষ্টি, নিরক্ষরতা ও বেকারত্বের অভিশাপ দেশটিকে আজ এক ভয়াবহ বিস্ফোরোন্মুখ পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছে। পরিণতিতে, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে সামাজিক অসন্তোষ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা।

ঐক্য বনাম বিভাজন ঃ

অতএব, ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও উন্নয়নের দাবী একই সূত্রে গ্রথিত। উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে, জাতীয় ঐক্য যা ছিল ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শিক্ষা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শক্তি। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় জনগণ ও নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এবং ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল বলেই উভয়ক্ষেত্রেই আমরা সফলকাম হতে পেরেছিলাম। অতএব, বায়ান্ন ও একাত্তরের চেতনা হচ্ছে, 'ঐক্য', 'বিভাজন' নয়; 'ঐক্যই' জনগণের শক্তি এবং 'ঐক্যই' সফলতার চাবিকাঠি। একতাই বল, বিভেদের অর্থ হচ্ছে পতন। তাই স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নে যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে হলেও জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

সাথে সাথে, আজ যারা সরাসরি বা কৌশলে জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরাবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত, তাদের তৎপরতা সম্পর্কেও আমাদের সচেতন হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ আছেন যারা "ঐক্য" নয় "বিভাজনের" রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, বিভাজনই হচ্ছে ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বিভাজনের মাধ্যমেই স্বাধীনতার দাবী অর্জন

www.icsbook.info

সম্ভব। স্বাধীনতার দুই দশকের মধ্যে হাঁটি হাঁটি পা পা করে আমরা যখন "জাতীয় সংহতি" প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনেকদূর এগিয়ে এসেছি, তখন একদল শ্লোগান তুলেছেন, "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা" ও "স্বাধীনতায় বিশ্বাসী" এবং "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা" ও "স্বাধীনতা বিরোধীদের" মধ্যে বিভাজনের প্রয়োজন। এর অর্থ হচ্ছে, দেশে একদল আছেন যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং অপর দল আছেন যাঁরা এসবে বিশ্বাসী নন! এতদিন পর হঠাৎ করে এ জাতীয় শ্লোগানের দ্বারা জাতিকে বিভক্ত করার পেছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? জাতিকে বিভাজন করলে কি হয়? বিভাজনের ফলে জাতি দু'টি বিবাদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শিবিরদ্বয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। ফলে জাতি দুর্বল হয়ে পড়ে। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের লক্ষ্য অর্জন ব্যহত হয়। উপরন্তু, পরাশক্তির প্রভাব বিস্তার সহজতর হয়। তাই আজ আমাদেরকে চিনতে হবে জাতিকে বিভাজনকারী এরা কারা? নিজেদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতার একচ্ছত্র দাবীদার এবং অন্যকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতা বিরোধী বলার অধিকার তাদেরকে কে দিয়েছে?

পুরোহিততন্ত্রীদের অশুভ তৎপরতা ঃ

জাতিকে বিভাজনকারীরা সংখ্যায় ক্ষুদ্র হলেও অত্যন্ত সুসংগঠিত। এরা সরকারী প্রশাসন, রাজনীতি ও বুদ্ধিজীবী মহলে খুবই তৎপর। বিভাজনকারীদের বক্তব্য ও তৎপরতাকে একটি মডেলের(Model)মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। কেউ কেউ এই মডেলের নাম দিয়েছেন, "পুরোহিততন্ত্র।"[১] এই তন্ত্রের মূলমন্ত্র হচ্ছে, দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরে বদ্ধ হয়ে থাকলেই জাতি সত্ত্বার বিকাশ ঘটবে। তাই স্বাধীনতা উত্তরকালে তাঁরা দাবী তুলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কোর্সসহ উচ্চ শিক্ষার সর্বস্তর থেকে ইংরেজী ভাষাকে উচ্ছেদ করতে হবে। স্বাধীনতার পর তাই করা হল। এতে কি আমাদের ডিগ্রীর মান উন্নত হয়েছে? একুশের সংগ্রামত ইংরেজী বা অন্য কোন ভাষার বিরুদ্ধে ছিল না। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে হঠাৎ করে ইংরেজী তুলে দেবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা পশ্চাৎপদ, গতিহীন ও কূপ-মন্ডূক হয়ে পড়ি। পুরোহিততন্ত্রের কর্মসূচীতে কিন্তু স্বল্প সময়ের ভিতর দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে অক্ষরজ্ঞান করা বা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কোন শ্লোগান অন্তর্ভূক্ত হয়নি। দেশ থেকে ইংরেজী তুলে দেবার সাথে সংগতি রেখে বাংলা ভাষাকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপারেও কিন্তু

[১] লুদক, "স্থান-কাল-পাত্র,", *দৈনিক ইত্তেফাক*, ফেব্রুয়ারী ১৬,১৯৮৮ ইংরেজী।

www.icsbook.info

পুরোহিততন্ত্রের প্রবর্তকেরা তেমন কোন সফলতার পরিচয় দিতে পারেননি। তাই জাতি হিসাবে আজ আমাদের উচিত হবে, যাবতীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে, বাংলা ভাষাকে উন্নত ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার সাথে সাথে, আন্তর্জাতিক জ্ঞান–বিজ্ঞান আহরণের জন্য ইংরেজী ভাষার চর্চাকেও গুরুত্ব প্রদান করা। চীন, জাপান, রাশিয়াসহ সকল অইংরেজীভাষী দেশে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার সাথে সাথে, দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী ভারতেরও বিভিন্ন রাজ্যে মাতৃভাষার চর্চা যেমন চলছে, তেমনি চলছে রাষ্ট্র ভাষা হিন্দীর চর্চা। আর তারই পাশাপাশি অব্যাহত রয়েছে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার।

দেশ থেকে ইংরেজী ভাষার চর্চা তথা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বন্ধের পর, পুরোহিততন্ত্রের পরবর্তী তৎপরতা হচ্ছে, বাংলায় বহুল প্রচলিত শব্দের স্থলে পর সংস্কৃতি থেকে ধারকৃত শব্দাবলী বাংলাদেশী ভাষায় প্রচলন। উদাহরণস্বরূপ, "অবিরামের" স্থলে "লাগাতার," "হরতালের" স্থলে "বন্ধ", "মরহুমের" স্থলে প্রয়াত", এবং "সভাপতিত্বের" স্থলে "পৌরহিত্য" ইত্যাদি। এভাবে আজ আমরা আমাদের ভাষার স্বকীয়তা হারাতে বসেছি। অপরদিকে, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা প্রচলনের নামে আমাদের শিক্ষাঙ্গণকে পরিণত করা হয়েছে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে প্রকাশিত বই পুস্তকের অবাধ বাজারে! অনেকেই আজ আশংকা প্রকাশ করছেন যে, এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে তা অচিরেই ধ্বংস করে দেবে এ দেশের লিখন শিল্প ও প্রকাশনা শিল্পকে। আমাদের সাহিত্য হারাবে তার মৌলিকত্ব। সম্প্রতি পত্রিকান্তরে প্রকাশিত বাংলাদেশের লেখক, কবি ও বুদ্ধিজীবিদের বক্তব্যে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

বিশ্বের প্রত্যেক জাতি তার নিজস্ব স্বকীয়তায় মহীয়ান। আমাদের পরিচিতি হচ্ছে আমরা "বাংলাদেশী"। আমাদের জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি হচ্ছে, ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি যা এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষের ঐতিহ্য, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও জীবনধারা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু পুরোহিততন্ত্রবাদীরা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মাবরণে 'সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল' এবং 'জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে "মুসলিম" শব্দটি বাদ দিয়ে সর্বপ্রথম আঘাত হেনেছে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির উপর! কিন্তু পার্শ্ববর্তী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের সর্ববৃহৎ সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 'বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির' "হিন্দু" শব্দটি অক্ষুন্ন রয়েছে। অনুরূপভাবে, সেখানকার মুসলমানদের সচেতনতা ও প্রতিরোধের মুখে, 'আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের' "মুসলিম" নাম বাদ দেয়া সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশের জনগণের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই বিশ্বের যে কোন দেশের উপর অপর দেশের অবৈধ হস্তক্ষেপের ঘটনায় প্রতিবাদী হয়ে উঠে। কিন্তু পুরোহিততন্ত্রবাদীরা বার্মার গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিজয়ী "লীগ ফর ডেমোক্রেসীকে" ক্ষমতা প্রদান না করার বিরুদ্ধে

www.icsbook.info

নিন্দাবাদে সোচ্চার হলেও আলজেরিয়ায় অনুরূপ নির্বাচনে বিজয়ী 'ইসলামী স্যালভেশন ফ্রন্টের' হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ঘটনায় উল্লসিত এবং প্রগতির নামে এ ধরণের অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপকে স্বাগত জানায়! তারা বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর কাল্পনিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিকভাবে সোচ্চার, কিন্তু বন্ধুদেশে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর মানবতা বিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে রহস্যজনক নিরবতা পালন করে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সকল রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি সংবেদনশীল। কিন্তু পুরোহিততন্ত্রবাদীরা এ দেশের অধিকাংশ জনগণের ধর্ম "ইসলামের" নাম শুনলেই সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খুঁজে পান। কিন্তু ভারত সরকার কর্তৃক মুরদাবাদের "ইসলামী কেন্দ্র" ও "মুসলিম কলেজ" বন্ধ ঘোষণা; সম্প্রতি উগ্রবাদী হিন্দুগণ কর্তৃক সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশকে উপেক্ষা করে অযোধ্যার ঐতিহাসিক "বাবরী মসজিদটিকে" ভেঙ্গে তদ্‌স্থলে রামমন্দির নির্মাণ,সরকারী বাহিনী কর্তৃক নয়াদিল্লী, কাশ্মীর, মীরাট ও বোম্বেতে নির্বিচারে মুসলিম নিধন অথবা বাংলাভাষী ভারতীয় মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে 'পুশ ইনের' মত মানবতা বিরোধী ঘটনায় তাদের মানবতাবাদী কণ্ঠ সোচ্চার হয় না।

পুরোহিততন্ত্রের প্রবর্তকেরা তাদের বন্ধু দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমাদের দেশ থেকে শিক্ষার্থী পাঠাবার ব্যাপারে যতটা উৎসাহী, বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে ততটা আগ্রহী নন। তাঁরাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে গণতন্ত্রায়নের নামে শিক্ষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং রাজনীতির নামে ছাত্রদেরকে কলমের বদলে অস্ত্র চালনায় উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিণত করছেন রণক্ষেত্রে। তাঁরা লোকজ উৎসব বা ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ বিরোধী অপসংস্কৃতি চর্চার ছদ্মাবরণে মূলতঃ অখন্ড ভারত আন্দোলনের মত বাংলাদেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত। এভাবে অত্যন্ত সুকৌশলে এবং তাঁদের শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে "পুরোহিততন্ত্রের" প্রবর্তকেরা বাংলাদেশের "জাতীয়তাবাদ", "জাতীয়তাবাদী শক্তি" ও "জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান" সমূহকে ধ্বংসের মাধ্যমে এদেশকে আঞ্চলিক শক্তির তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার এক দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে জাতিকে বিভাজনে সচেষ্ট হয়েছেন।

তাই জাতি হিসাবে আজ আমাদের আত্ম উপলব্ধির প্রয়োজন। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্নিহিত দাবী অর্থাৎ ন্যায়বিচার বা জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সফল করতে হলে, আজ আমাদেরকে যে কোন মূল্যে আমাদের "জাতীয় ঐক্য" অক্ষুন্ন রাখতে হবে। সাথে সাথে, জাতিকে বিভাজনকারী "পুরোহিততন্ত্রের" সকল ধরণের তৎপরতাকে নস্যাৎ করার ব্যাপারেও আমাদেরকে সক্রিয় হতে হবে।

www.icsbook.info

শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস ঃ কারণ চিহ্নিতকরণ*

[মুক্তবুদ্ধির চর্চা, জ্ঞান সাধনা এবং মানবিক বিকাশের বদলে অনভিপ্রেত সন্ত্রাসী তৎপরতা স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গণ বিশেষতঃ সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে আজ একটি উদ্বেগজনক বাস্তবতা। বিভিন্ন আলোচনা ও কমিশন রিপোর্ট থেকে এটা স্পষ্ট যে লক্ষ্যহীন ও আদর্শ বিবর্জিত শিক্ষা, শিক্ষকদের মধ্যে অনভিপ্রেত রাজনৈতিক কোন্দল এবং রাজনৈতিক দলের লেজুড় হিসাবে ছাত্র সংগঠন সমূহের তৎপরতা ও পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা, মূলতঃ এগুলোই হচ্ছে আজ শিক্ষাঙ্গণে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য দায়ী]

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে, বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে যেন অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের ভাষায়, "সন্ত্রাসোৎসব" এর মহড়া শুরু হয়েছে! মাত্র একানব্বই সালের মধ্যেই বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন সমূহের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে পড়েছে। পূর্বতন শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ এ, কিউ, এম, বদরুদ্দোজা চৌধুরী শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসকে আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসাবে অভিহিত করে জাতির ভবিষ্যতের স্বার্থে, এ সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট সবাইর সহযোগিতা কামনা করেছেন। কিন্তু সন্ত্রাসের প্রচন্ডতা এতই ভয়াবহ যে, জাতির মহান সংগ্রাম সমূহের নেতৃত্ব প্রদানকারী খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই সন্ত্রাস প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণের জন্য আয়োজিত ২৭শে মে (১৯৯১) এর সভাটি পন্ড হয়ে গেল উপাচার্যের সভা কক্ষে সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে!

স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনায় জাতির সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ৪০ জনেরও অধিক ছাত্রের প্রাণহানি ঘটেছে। একই কারণে রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও

---

*সৌজন্যে ঃ *দৈনিক ঈশান*, চট্টগ্রাম, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৯১ ইংরেজী।

www.icsbook.info

ময়মনসিংহ বিশ্ববিদ্যালয়কে বন্ধ করতে হয়েছে বহুবার। বারবার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে দেশের উচ্চতর জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা কর্ম এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে "সেশন জটের" মত অনাকাঙ্খিত সমস্যা। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। কিন্তু মুক্তবুদ্ধি, জ্ঞানচর্চা ও মানবিক বিকাশের বদলে অনভিপ্রেত সন্ত্রাসী তৎপরতা স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গণসমূহে আজ একটি উদ্বেগজনক বাস্তবতা। তাই সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটি সমাবেশের আয়োজন করেছেন। এ ছাড়াও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়েছে। ইতোপূর্বে সরকার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে চেয়ারম্যান করে শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সরকারী আমলা ও রাজনীতিবিদদের (সংসদ সদস্য) সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটিও গঠন করেছেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস কমেনি, বরং অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়েই চলেছে। সন্ত্রাসের শিকড় এতই গভীরে প্রোথিত যে শুধু সমাবেশ বা কমিটি গঠনের মাধ্যমে এ জাতীয় মহাব্যধি প্রতিহত করা সম্ভবপর হবে বলে মনে হয় না। এজন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অব্যাহত আলোচনা, মৌলিক বিষয় সমূহের ব্যাপারে সুস্পষ্ট জাতীয় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা এবং ছাত্র সমাজের মধ্যে সন্ত্রাস বিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি করা। এতদ্‌উদ্দেশ্যেই মূলতঃ এই প্রবন্ধের অবতারণা। এতে লেখকের দৃষ্টিতে শিক্ষাঙ্গণে বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সন্ত্রাসের কারণ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও সন্ত্রাস ঃ

"বিশ্ববিদ্যালয়" হচ্ছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং জ্ঞান ও আদর্শের একটি সার্বক্ষণিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও ভাবের আদান-প্রদানের কেন্দ্র । এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞানের আহরণ ও বিতরণ কর্ম সম্পাদিত হয়। কিন্তু নির্ভেজাল জ্ঞানচর্চা ছাড়াও আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মে অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য দেশের যুবশক্তিকে উপযোগী করে গড়ে তোলাও বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মহান জাতীয় দায়িত্ব। এ ছাড়াও জাতীয় সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ ও সমাধানের পথ নির্দেশনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে সমাজ উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়।

অপরদিকে, অধুনা বহুল ব্যবহৃত "সন্ত্রাস" শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করা দুরূহ ব্যাপার। অক্সফোর্ড ডিক্‌শনারীর মতে, "সন্ত্রাস" হচ্ছে ভীতি প্রদর্শনের

www.icsbook.info

মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করা। ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যম হচ্ছে শক্তি প্রয়োগ যা প্রচলিত আইন ও মূল্যবোধের বিচারে অবৈধ বা আইন অননুমোদিত। এখানে রাজনৈতিক স্বার্থ বলতে গোষ্ঠিগত স্বার্থকে বোঝান হয়েছে। এবং এ জাতীয় স্বার্থ হাসিলের প্রক্রিয়া দু'ধরনের হতে পারে ঃ *এক*, অবৈধভাবে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কিছু অর্জন করা। উদাহরণস্বরূপ, কর্তৃপক্ষের অনুমতি বা অনুমোদন ব্যতিরেকে হলের সিট দখল করা বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বৈধ অবস্থানকারীদের উচ্ছেদ করা; উপাচার্যের অফিস ঘেরাও বা বোমাবাজির মাধ্যমে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বাতিলকরণ; অনুষদের ডীনের অফিস ভাংচুরের মাধ্যমে পরীক্ষা পেছানো ইত্যাদি। *দুই*, গোষ্ঠী স্বার্থে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যকে তার আইনগত অধিকার চর্চা ও কর্তব্য পালনে বাধা দেওয়া বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। যেমন, কোন ছাত্র সংগঠন কর্তৃক আহুত ধর্মঘটকে সফল করার লক্ষ্যে অন্যদের জন্যও ক্যাম্পাসকে অচল করে দেয়া; ক্লাস্ চলাকালীন সময়ে গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার নামে মাইকযোগে সভা করা; করিডোরে মিছিল ও শ্লোগান ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যের শিক্ষাকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা; সংসদ নির্বাচনের সময় প্রতিপক্ষ সংগঠনকে মনোনয়নপত্র জমা দিতে না দেওয়া ইত্যাদি। বলা অনাবশ্যক যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্থাৎ জ্ঞানচর্চা এবং দেশ গড়ার উপযোগী প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ সৃষ্টির জন্য একটি অবাধ ও সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষার পরিবেশ হচ্ছে অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের কারণসমূহ ঃ

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গণ সমূহে বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধির বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। তন্মধ্যে শিক্ষার সাথে সম্পর্কহীন এবং শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত দু'টি বিষয়কে আলোচ্য প্রবন্ধে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিক্ষার সাথে সম্পর্কহীন বিষয়টি হচ্ছে, ক্যাম্পাস রাজনীতি এবং শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত বিষয়টি হচ্ছে, লক্ষ্য ও আদর্শ বিবর্জিত শিক্ষা।

ক্যাম্পাস রাজনীতি ঃ শিক্ষক

বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গণে জ্ঞানচর্চার স্থলে সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পাবার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, ক্যাম্পাস রাজনীতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষিত লক্ষ্য হচ্ছে, জ্ঞান চর্চা। রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কর্মসূচীর অংশ নয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও রাজনীতি পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ বলে পরিচিত বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গণে একটি উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

www.icsbook.info

রাজনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব করার বা সংগঠনের সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। আধুনিক রাজনীতির শিক্ষাগুরু Machiavelli এর মতে, End justifies the means অর্থাৎ ক্ষমতা দখলের জন্য পরিচালিত যে কোন তৎপরতাই বৈধ। এটিই হচ্ছে রাজনীতির মূলমন্ত্র। এখানে সততা বা নৈতিকতার কোন স্থান নেই। অপরদিকে, দর্শনের শিক্ষাগুরু সক্রেটিসের মতে, Virtue is knowledge অর্থাৎ জ্ঞানচর্চার অর্থ হচ্ছে সততার চর্চা। অতএব, রাজনীতি ও জ্ঞানচর্চা দু'টি পরস্পর বিরোধী স্রোত, একত্রিত হলেই সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শিক্ষকদের মধ্যে রাজনৈতিক কোন্দল সৃষ্টির বৈধ সুযোগ ও প্রয়োজন সৃষ্টি করে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট নামে ১৯৭৩ সালে প্রণীত একটি আইন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সহ বিভিন্ন বিধিবদ্ধ পর্ষদে (সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল ইত্যাদি) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার একটি নেতিবাচক পরিণতি হচ্ছে দলাদলী, এবং দলীয় স্বার্থ আদায় ও দলীয় অবস্থানকে সুদৃঢ় ও স্থায়ী করণের প্রচেষ্টা। এবং এসব করা হয় নির্বাচিত উপাচার্যের প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগের মাধ্যমে। এতে প্রতিপক্ষ দলের মধ্যে সৃষ্টি হয় ক্ষোভ ও প্রতিবাদ। পরিণতিতে সৃষ্টি হয় (শিক্ষাকর্মের সাথে সম্পর্কহীন) অনভিপ্রেত তৎপরতা।

ক্যাম্পাসে শিক্ষক রাজনীতির একটি আশংকাজনক প্রবণতা হচ্ছে, শিক্ষকদের দলাদলী আদর্শের ছদ্মাবরণে ক্রমান্বয়ে ক্যাম্পাসে সক্রিয় ছাত্র সংগঠন সমূহের রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ দলীয় স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন রিপোর্ট)। এতে একদিকে পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ নিরপেক্ষতা হারাচ্ছেন এবং অপরদিকে , এর দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হচ্ছে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি। এতে ব্যহত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চার পরিবেশ, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই। কিন্তু এতে সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিদেশী খয়রাতির উপর নির্ভরশীল বিশ্বের এই দরিদ্রতম প্রজাতন্ত্রের কর প্রদানকারী সাধারণ মানুষ।

ক্যাম্পাস রাজনীতি ঃ ছাত্র

বাংলাদেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টির

www.icsbook.info

অপর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, ছাত্র রাজনীতি। ছাত্র সংগঠনগুলি ক্যাম্পাসে জাতীয় রাজনৈতিক দলসমূহের সন্মুখ সংগঠন (Front organization) হিসাবে পরিচিত। ক্যাম্পাসে শিক্ষা পরিবেশের উন্নয়ন, ছাত্র কল্যাণ বা দলীয় আর্দশগত কর্মসূচীর চাইতেও ক্যাম্পাস বহির্ভূত রাজনৈতিক দলের নির্দেশ ক্রমেই এগুলি পরিচালিত হয় বেশী। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি প্রত্যাশা করে যে, সরকার বিরোধী আন্দোলন সমূহ সংগঠিত হবে শিক্ষাঙ্গণ থেকে, এবং এ ব্যাপারে তাদের অঙ্গ সংগঠনগুলিকে প্ররোচিতও করে থাকে। অপরদিকে, ক্ষমতাসীন সরকার চায় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গণে সরকার বিরোধী যে কোন আন্দোলনকে প্রতিহত করতে। অতএব, দলীয় আদর্শের প্রচার ও কল্যাণমূলক তৎপরতার চাইতেও প্রতিপক্ষ সংগঠনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারই হচ্ছে সাম্প্রতিককালে ছাত্র রাজনীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

প্রায় সবগুলি ছাত্র সংগঠনই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রধানতম পূর্বশর্ত "সহনশীলতা" গুণটি এদের মধ্যে অনুপস্থিত বললেই চলে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ে পড়াশুনাই থাকে ছাত্র-ছাত্রীদের মুখ্য চিন্তা ও লক্ষ্য। এটা শিক্ষক-অভিভাবকদেরও কামনা। এবং ছাত্রদের কাছে এটিই হচ্ছে প্রধান জাতীয় প্রত্যাশা। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে অস্পষ্টতা বা হতাশা এবং অনেক সময় ক্ষমতাসীন সরকারের ব্যর্থতা বা দায়িত্বহীনতা, ছাত্রদেরকে পড়াশুনার বদলে প্রতিবাদমুখী/রাজনীতিমুখী করে তোলে। সঙ্গত কারণেই রাজনৈতিক মতদ্বৈততা ও দলাদলি, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-শৃংখলার প্রতি অবজ্ঞা এবং সর্বোপরি, সহনশীলতার মত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার অভাবের কারণে, ক্যাম্পাস হয়ে উঠে সন্ত্রাস মুখর এলাকা।

বিভিন্ন আলোচনা ও কমিশন রিপোর্ট থেকে এটা স্পষ্ট যে, শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি বা কোন্দল, রাজনৈতিক দলের লেজুড় হিসাবে ছাত্র সংগঠন সমূহের তৎপরতা, পারস্পরিক সংঘর্ষ, ধর্মঘট, অনির্ধারিত বন্ধ ও সেশন জট ইত্যাদিই হচ্ছে আজ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য দায়ী। জাতির জন্য এসব অনভিপ্রেত হলেও এগুলোই আজ জাতির উচ্চতর শিক্ষাঙ্গণে সবচাইতে সচল প্রক্রিয়া। কেননা এগুলো ধীরে ধীরে আজ প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতা অর্জন করছে। বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট (১৯৭৩) এর আওতায় ভাইস-চ্যান্সেলর, অনুষদ ডীন, সিনেট ইত্যাদি নির্বাচনকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দলাদলিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করা হয়েছে।

www.icsbook.info

ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠন সমূহের অবাধ রাজনৈতিক তৎপরতাকে বৈধ করে সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে। নির্বাচিত উপাচার্যের পক্ষ–বিপক্ষীয় শিক্ষকগণের কোন্দল এবং ছাত্র সংগঠনগুলির পারস্পরিক সংঘাতের ফলে অনির্ধারিত বন্ধের কারণে সৃষ্টি হয়েছে সেশন জট। এসবের সমাধান আজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একক ক্ষমতার বাইরে। এগুলি আজ সমস্যা জর্জরিত জাতির জন্য সৃষ্টি করেছে অতিরিক্ত ক্ষত। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, জাতি বিধ্বংসী এ সকল তৎপরতায় ক্রমাগতভাবে উস্কানী যুগিয়ে চলেছেন এক শ্রেণীর তথাকথিত ও প্রগতিবাদী বলে আত্মপরিচয়প্রদানকারী বুদ্ধিজীবী এবং তাদের সহযোগী সংবাদপত্রসমূহ। এবং এসব করা হচ্ছে "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা"র দোহাই দিয়ে এবং স্বাধীন দেশে "গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চা"র নামে! আর এসকল অনভিপ্রেত অথচ সচল তৎপরতার মাঝে অচল হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূখ্য শিক্ষা কর্ম, অর্থাৎ পাঠদান, গবেষণা ও প্রকাশনার মত জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ড।

পৃথিবীতে বহু স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশ রয়েছে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কোন নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োজিত হন না, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ শিক্ষকদের দলাদলি করার বা মাসের পর মাস নির্ধারিত ক্লাস গ্রহণ না করে বহিরাঙ্গণের রাজনীতিতে সক্রিয় হবার অবাধ লাইসেন্স প্রদান করে না এবং যেখানে ক্যাম্পাসে ছাত্রদের অবাধ রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ। সেসব দেশ কিন্তু উন্নত, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের যে কোন সংজ্ঞায় তারা গণতান্ত্রিক এবং স্বাধীন। উন্নত দেশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন বা ফ্রান্সের কথা না হয় বাদই দিলাম, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, ভারত ও পাকিস্তান আমাদের মতই বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ। এসকল দেশেও তো কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি আমাদের মত নয়। ওখানে সবাই শিক্ষাঙ্গণের পবিত্রতা বা সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার গুরুত্ব বুঝে। এসব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু জ্ঞানচর্চাই হয়, রাজনীতি ওখানে মুখ্য নয়। আমরা লজ্জাবোধ করি না যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পৃথিবীর কোথাও মানসম্মত ডিগ্রী হিসেবে বিবেচিত হয় না! আমাদের মত কোথাও কি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বছরের কোর্স শেষ করতে পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়? আইনগত না হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, রাজনীতিবিদ ও ছাত্র নেতৃবৃন্দের জন্য এটি একটি নৈতিক চিন্তার বিষয়।

www.icsbook.info

লক্ষ্য ও আদর্শ বিবর্জিত শিক্ষা ঃ

শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পাবার অপর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, লক্ষ্য ও আদর্শ বিবর্জিত শিক্ষা । শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে এদেশের সরকার, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্পষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে। বিশ্বের যে কোন দেশে শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, জাতীয় লক্ষ্যের প্রতি তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিশ্রুতিশীলতা (Commitment) সৃষ্টি করা, এবং এজন্য একদল দক্ষ, সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মী বাহিনী গড়ে তোলা।

প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের জাতীয় লক্ষ্য কি? একাত্তরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে, ১০ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার আম্রকাননে প্রবাসী বাংলাদেশ (মুজিবনগর) সরকার কর্তৃক দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের সামনে ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের জনগণের জন্য "সাম্য", "মানবিক মর্যাদা" ও "সামাজিক ন্যায়বিচার" প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছিল।[১] কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র, শিক্ষাসূচী, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক লক্ষ্য হিসাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি অর্ন্তভূক্ত না হওয়ার কারণে, প্রচলিত শিক্ষার মাধ্যমে দেশে জাতীয় লক্ষ্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল কর্মী বাহিনী তৈরী হচ্ছেনা। শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন তত্ত্ব ও আদর্শের সমন্বয়ে গঠিত আধুনিক মূল্য নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের চিন্তাকে শুধু বিভ্রান্তই করেছে।[২] আমাদের শিক্ষাসূচীতে আছে শঠতাপূর্ণ চানক্যের অর্থশাস্ত্র ও ম্যাকিয়াভেলীর রাজনীতি যেখানে মূল্যবোধ বা নৈতিকতার কোন স্থান নেই। আমাদের অর্থনীতিতে আছে রিভিশনিষ্টদের তত্ত্ব যেখানে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে দুর্নীতি পূঁজিগঠন তথা উন্নয়ন ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক! মাধ্যমিক পর্যায়ে শেখানো হয়, দশ টাকা সের দরে এক মণ দুধের সাথে দশ সের পানি মিশিয়ে প্রতি সের কত টাকা দরে বিক্রি করলে শতকরা ৫০ ভাগ লাভ হবে ইত্যাদি। এভাবে সমাজে অন্যকে ঠকিয়ে স্বার্থ উদ্ধারের কৌশল শিক্ষার্থীদের চিন্তায় ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে! আর এরই অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তৈরী হয়ে যারা বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োজিত হয়েছেন তাদের মধ্যে

---

[1] *The Sunday Standard*, New Delhi, April 18,1971; *Bangladesh Document*, Vol-1, p:282; হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিল পত্র*, তৃতীয় খন্ড, ১৯৮২, পৃঃ ৫।

[২] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Dr. Syed Sajjad Hossain and Dr. Syed Ali Ashraf, *Crisis in Modern Education* (Jeddah: King Abdulaziz University, 1979).

www.icsbook.info

শতকরা ৭৩ ভাগের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।[৩] উক্ত রিপোর্ট পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, সরকারী কর্মচারী/কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতির প্রবণতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই চিত্রের প্রতিফলন ঘটছে দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, শিল্প-ব্যবসা এবং সমাজের অপরাপর ক্ষেত্রে। বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী মহানবী (সঃ) বলেছেন, "আমরা সেই জ্ঞান থেকে পানা চাই যা মানুষের জন্য কোন কল্যাণ বহন করেনা" (*ইবনে মাজা*)। এমন গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ বাণীটি মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের শিক্ষানীতি প্রণয়নে পথ নির্দেশিকা হতে পারে। আমরা সমাজে মূল্যবোধের কথা বলি। কিন্তু যারা ভবিষ্যতে সমাজ গঠনে নেতৃত্ব দেবে তাদের চিন্তা ও আচরণে যাতে কাঙ্খিত মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে এমন কোন বিষয় আমাদের শিক্ষাসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হয়নি।

বাংলাদেশের প্রাক্তন এটর্নী জেনারেল ও বিশিষ্ট আইনবিদ ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশ্‌তিয়াক আহমেদের মতে, "আমাদের মত দেশে কর্তৃত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের জন্য 'নৈতিকতা' ও 'সততা' অপরিহার্য কেননা, তাঁদের নীতিহীনতা ও অসৎ প্রবণতা রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে ব্যহত হয় উন্নয়ন প্রক্রিয়া । এতে করে সমগ্র দেশ ও জাতি সংকটের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়"।[৪]

শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় জাতীয় সম্পদ সৃষ্টির জন্য উপযোগী দক্ষ মানব কর্মী সৃষ্টি করা, তাহলে সেই উৎপাদিত সম্পদ যাতে সমাজে বসবাসকারী সবার মধ্যে ন্যায়ের ভিত্তিতে বন্টিত হয়, এজন্য প্রয়োজন বন্টনকারীদের মধ্যে সততা ও ন্যায়বোধ জাগ্রত করা। আর এর অভাব হলেই সমাজে সৃষ্টি হয় শোষণ ও বঞ্চনা, যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে, ক্ষোভ ও সামাজিক অস্থিরতা। তাই আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে রাজনীতি ও দর্শনের আদি শিক্ষাগুরু এরিস্টোটল (Aristotle) অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, প্রাণীকূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেও "নমোচ" (সততা) ও "ডাইকে" (ন্যায়বোধ) বিবর্জিত মানুষ হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট। অতএব, তিনি ও তাঁর শিক্ষাগুরু প্লেটো উভয়েই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিক্ষার মাধ্যমে

---

[৩]১৯৮৮ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের *বার্ষিক রিপোর্ট*, পৃঃ ২১।

[৪]বিগত ৩০শে জানুয়ারী'৯১ ইংরেজী ঢাকা প্রগতি লায়ন্স এর অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ, *দৈনিক আজাদী*, চট্টগ্রাম, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ ইংরেজী।

www.icsbook.info

মানুষের বিশেষতঃ শাসক শ্রেণীর মধ্যে সততা ও ন্যায়বোধ জাগ্রত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

মানব জাতির জীবন দর্শন পবিত্র কুরআনেও ন্যায়বিচার ও মানব কল্যাণ ভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে মানুষের মধ্যে "সততা" ও "নিঃস্বার্থপরতার" গুণাবলীর বিকাশ এবং "মানব কল্যাণের" চেতনা জাগ্রত করার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (সুরা নাহল ১৬ঃ ৯০, সুরা ইয়াসীন ঃ ২১, সুরা বায়্যিনাঃ ৭-৮)।

কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাসূচীতে এজাতীয় মূল্যবোধের অভাবের কারণে শিক্ষাকর্ম হয়ে পড়েছে লক্ষ্যহীন এবং আদর্শ বিবর্জিত একটি গতানুগতিক প্রক্রিয়া। পরিণতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরাজ করেছে চরম হতাশা যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে, রাজনীতির নামে অস্থিরতা ও অব্যাহত সন্ত্রাস।

শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ ঃ

সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রধানতঃ তিনটি পদক্ষেপ অনুসরণ করা হয় ঃ (১) সমস্যা চিহ্নিতকরণ, (২) সমস্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাধানের বিকল্প সমাধান উদ্ভাবন, এবং (৩) যথার্থ সমাধানটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। এই প্রবন্ধে শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসের কারণ হিসাবে দু'টি প্রধান সমস্যাকে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা হয়েছে। এর সমাধান নির্ধারণের পুর্বে প্রয়োজন এসকল চিহ্নিত কারণসমূহের ব্যাপারে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার। এটা সম্ভব হলে সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি আর কোন কঠিন ব্যাপার হবে না। কেননা, প্রতিটি সমস্যার মধ্যেই নিহিত থাকে তার সমাধানের ইংগিত।

www.icsbook.info

সন্ত্রাসমুখর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মঙ্গলপ্রদীপ সংস্কৃতি*

[প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত কপালে মঙ্গলপ্রদীপধারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্রই যেন আজ অমঙ্গলের প্রতিচ্ছায়া! শিক্ষা ও গবেষণার চাইতে আগ্নেয়াস্ত্র বা পেশীবলই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটাস সিম্বল্। অনেকেই একথা জানেনা যে অত্র এলাকার অনগ্রসর মুসলমান সমাজ শিক্ষার মাধ্যমে উন্নতি লাভ করবে বিধায় বঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধিতা করেছিল। অথচ তাদেরই প্ররোচনায় আজ মুসলমানদের আন্দোলনের ফলে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ইসলাম' 'মুসলিম', ও 'আল্লাহ্'র নাম মুছে দেয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে 'পড়া' সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত তুলে দিয়ে তদস্থলে আগ্রাসী বাবু সংস্কৃতির প্রতীক মঙ্গলপ্রদীপ বসানো হয়েছে! এভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আদর্শহীন করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সন্ত্রাসী তৎপরতার উস্কানী প্রদানের জন্য শিক্ষকতার চাইতেও রাজনীতিতে অধিকতর সক্রিয় প্রগতিবাদী বলে আত্মপরিচয়দানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর শিক্ষক মূলতঃ দায়ী]

এক কালের ঐতিহ্যবাহী 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' নামে মশহুর এ ভূখন্ডের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্রই যেন আজ অমঙ্গলের প্রতিচ্ছায়া! ওখানে আজ আর জ্ঞান বা সততা এবং যুক্তি বা বিবেক নয় বরং চাঁদাবাজ ও মাস্তানদেরই প্রাধান্য চলছে। ওখানে ছাত্রের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়; ওখানকার ছাত্র নামধারী চাঁদাবাজ মাস্তানদের দৌরাত্ম্য থেকে 'আমাদেরকে বাঁচান' বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকাদারগণকে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন মারফত প্রধানমন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন জানাতে হয়; ওখানে প্রায়শঃই প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধ হয়; ওখানকার নামী-দামী প্রগতিবাদী অধ্যাপকদের কেউ কেউ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে খুনী টিক্কা খানের আনুগত্য করে থাকলেও আজ 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' ও 'স্বাধীনতার

---

*সৌজন্যেঃ *দৈনিক মিল্লাত*, ঢাকা, ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৯২ ইংরেজী।

www.icsbook.info

পক্ষের শক্তি' পরিচয়ে ছাত্রদেরকে সন্ত্রাসী তৎপরতায় উস্কানী যোগিয়ে চলেছেন; ওখানে ইসলামের প্রতীক দাঁড়ি-টুপি পরিহিতদের উপর হামলা হয়; ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে দিন-দুপুরে যুবক-যুবতীরা অশোভনীয় আচরণে লিপ্ত হয় এবং এতে বাধা দিতে গেলে অধ্যাপককেও প্রহৃত হতে হয়; ঐ এলাকায় দিন -দুপুরে পথচারীদের জিনিষপত্র ছিনতাই হয় বলে রিক্সাওয়ালা পর্যন্ত আরোহী বহন করতে সাহসী হয়না। কবির কবিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিহ্নিত হয়েছে 'ডাকাতের গ্রাম' হিসাবে। যখন তখন গাড়ী ভাংচুর হয় বলে প্রাইভেট কারের ড্রাইভারেরা সযত্নে বিশ্ববিদ্যালয় রোড এড়িয়ে চলে। এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সম্প্রতি ঢাকার একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকের সম্পাদকীয়তে লিখা হয়েছে ঃ "চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী সবাই আজ অসহায়"; "শিক্ষায় ব্যাঘাত, গবেষণায় বিঘ্ন, নিরাপত্তায় বাধা, শালীনতা রক্ষায় ব্যর্থতা, এমনকি প্রাণ রক্ষায় অপারগতার মত নির্মম পরিণতিও ঘটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বই-পুস্তক, গবেষণাপত্র ও সাহিত্য সাধনার চেয়ে আগ্নেয়াস্ত্র বা পেশীবলই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটাস সিম্বল"।[১]

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের এই ভয়াবহ দৃশ্য শুধু বেদনাদায়ক ও লজ্জাকরই নয়, এতে দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের মধ্যে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের যে প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে, তা জাতিকে শুধু হতাশই করেনি, রীতিমত ক্ষুব্ধ করেছে। এ সকল ঘটনা যে বিদেশী খয়রাতির উপর নির্ভরশীল একটি অনুন্নত ও মুসলিম প্রধান দেশের জন্য অনভিপ্রেত, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির নির্ণায়ক, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চিত্র আজ পরিকল্পিতভাবে দেশব্যাপী পরিচালিত এক ধরনের "রাজনৈতিক সংস্কৃতির" একটি বাস্তব প্রতিপাদন বলা যায়।

প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যাপীঠে কেন এ জাতীয় অনাকাংক্ষিত আচরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে? বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সার্বজনীনতার প্রতীক, একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্তর্জাতিকতার কেন্দ্রভূমি (Centre for intellectual internationalism)। ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এক বক্তৃতায় বলেছেন ঃ "বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান হচ্ছে মানবতা, সহনশীলতা ও যুক্তির জন্য এবং

---

[১] *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ৯ই জুন, ১৯৯২ ইংরেজী।

www.icsbook.info

সত্যের অনুসন্ধান ও আদর্শের সম্প্রসারণের মাধ্যমে মানবতার অগ্রযাত্রায় পথ প্রদর্শনের জন্য।" বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ এবং সমাধানের পথ নির্দেশনা প্রদান করা। সংক্ষেপে, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে শিক্ষক ও ছাত্র এবং জ্ঞান ও আদর্শের সার্বক্ষণিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও ভাবের আদান-প্রদানের স্থান। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকালীন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে মনে হয় এটি আজ আগ্রাসী সংস্কৃতির বাহক শিল্পী সমরজিত চৌধুরী পরিকল্পিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবেগ ও উস্কানি বিনিময় এবং অপসংস্কৃতি চর্চা ও অবাধ সন্ত্রাসী তৎপরতার একটি বাস্তব রূপায়ন। এ ব্যাপারে ছাত্র নামধারী মাস্তানরা যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী শিক্ষাকর্মের চাইতেও রাজনীতি চর্চায় অধিকতর সক্রিয় এক শ্রেণীর শিক্ষক বুদ্ধিজীবী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশব্যাপী সন্ত্রাসী তৎপরতার এই ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থাকবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সম্পর্কিত আলোচনাকালে কয়েকজন শ্মশ্রুধারী শিক্ষক সম্প্রতি লেখককে জানিয়েছেন যে, তাঁরা ইদানীং খুব শংকিত জীবন যাপন করছেন, কেননা প্রায়শঃই ক্যাম্পাসে দাঁড়ি-টুপি পরিহিতদের উপর হামলা হয়! এমনকি দাঁড়ি-টুপিওয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররাও নাকি আজকাল তাদের সার্টিফিকেট তোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গণে আসতে সাহসী হচ্ছে না! দিন কয়েক পূর্বে এস, এম, হলে অবস্থানকারী জনৈক ছাত্রের শ্মশ্রুধারী অতিথিকে (যিনি একটি মসজিদের ইমাম) শুধু মুখে দাঁড়ি রাখার অপরাধে হল থেকে ধরে নিয়ে তার দু'পায়ের রগ কেটে দেয়া হয়েছিল! এ সংবাদটি পত্রিকায় ফলাও করে প্রচারও করা হয়েছিল। কিন্তু কোন প্রতিকার হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র এবং একাত্তরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনকারী হিসেবে নিজেকে অনেক সময় অপরাধী মনে হয় এই ভেবে যে, এজন্য কি আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছি যেখানে আমার এবং এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম বা ধর্মের প্রতীককে অপমান করা হবে? পাকিস্তান আমলে আমাদের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এন, এস, এফ-এর কর্মীরা মাঝে মাঝে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টি করত ঠিকই, যেমন করত স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ শাসনামলে মুজিববাদী ছাত্রলীগের কর্মীরা। কিন্তু কখনও কোন ধর্মের প্রতীককে অপমান করার ঘটনা ঘটেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর নাস্তিক ও

www.icsbook.info

তথাকথিত প্রগতিবাদী শিক্ষক এ সকল সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ডের হোতা বলে অভিযোগ রয়েছে।

সাম্প্রতিককালে (২৭শে মে, ১৯৯১), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমন্ত্রিত জনৈক জন প্রতিনিধি এবং একটি রাজনৈতিক দলের সংসদীয় নেতাকে ভিসি ও সিন্ডিকেট সদস্যদের সাথে আলাপরত অবস্থায় একদল উচ্ছৃংখল ছাত্র আক্রমণ করে গুরুতরভাবে আহত করেছে। তাঁর দাঁড়ি ধরে টানা-হেঁচড়াও করা হয়েছিল। ছাত্রদের এহেন জঘন্য আচরণের জন্য তাদেরকে ভর্ৎসনা না করে তখন একদল শিক্ষক এর মাধ্যমে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার' বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলে ছাত্রদেরকে অভিনন্দিত করেছিলেন। সেদিন তাঁদের সেই অবিবেচনা প্রসূত বিবৃতি পড়ে ঢাকার একটি ইংরেজী সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয়তে পান্ডিত্যের গর্বকারী ঐসকল শিক্ষকদেরকে "বুদ্ধিবৃত্তিক শূন্যতায়" (Intellectual bankruptcy) ভুগছেন বলে তিরস্কার করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন ক্যাম্পাসে ছাত্রদেরকে 'রাজনৈতিক সন্ত্রাসে' উস্কানি প্রদানের জন্য ৫২ জন তথাকথিত প্রগতিবাদী বলে আত্মপরিচয়দানকারী শিক্ষককে অভিযুক্ত করেছে বলে পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এ সকল শিক্ষকদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠা সেই কালসাপ (সন্ত্রাস!) আজ তাঁদেরকেই দংশন করছে![২] এতে বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হবার কিছুই নেই। এটাই ইতিহাসের বাস্তব ও অলংঘনীয় পরিণতি।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মানের দ্রুত অবনতি ঘটছে বলে প্রতি বছর সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক রিপোর্টে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের বাইরে কোথাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীকে স্ট্যান্ডার্ড ডিগ্রী হিসেবে স্বীকার করা হয় না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও ডিগ্রীর মান উন্নয়নের ব্যাপারে আমাদের শিক্ষাবিদ্‌দের কোন মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয়না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর প্রবীণ শিক্ষাবিদ ছাত্রদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, পরমত সহিষ্ণুতা এবং মানবিক মূল্যবোধ জাগরিত করার পরিবর্তে, ইদনিং দেশের প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা ও সাংবিধানিক

---

[২]সম্প্রতি পরীক্ষায় অকৃতকার্য জনৈক ছাত্রের হাতে পদার্থ বিদ্যা বিভাগের শিক্ষক ডঃ বদরুল আলম লাঞ্ছিত হবার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ধর্মঘট করেছেন। আবার তারই প্রতিবাদে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ মিছিল বের করেছে এবং কলা ভবনে অবস্থিত শিক্ষক লাউঞ্জে হামলা চালিয়েছে।

www.icsbook.info

পদ্ধতিকে লংঘন করে সরাসরি দেশব্যাপী হিংসা-হানাহানি ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী গণআদালতী তৎপরতায় শরীক হয়েছেন। তাদের মধ্যে কয়জন সেদিন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন যে, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার' দোহাই দিয়ে তারা এতে বাড়াবাড়ি করছেন? তাঁদের মধ্যে অনেকেইত সেদিন একাত্তরের খূনী টিক্কা খানের আনুগত্য করেছিলেন! তাদের মুখেত 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' কথাটা শোভা পায়না। ঢাকার প্রধান মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে রাজনৈতিক সন্ত্রাসীদের হামলার পর পরই, জাতির বিবেক বলে দাবীদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি জরুরী সভা করে উপরোক্ত ঘটনার কোনরূপ নিন্দা না করে, চ্যান্সেলরের পদ থেকে জননির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাসকে অপসারণের দাবী জানিয়ে গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে নতুন ইস্যু সৃষ্টিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজ এই কলংকজনক পরিণতি?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভুলে যাওয়া ইতিহাস ঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিককালে যা ঘটছে বা ঘটান হচ্ছে, জনৈক প্রবীণ শিক্ষবিদের ভাষায় তা হচ্ছে, 'মঙ্গল প্রদীপ সংস্কৃতি', শিল্পী সমরজিত চৌধুরীর স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে তার ঐতিহাসিক লক্ষ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে পড়েছে তা বুঝার জন্য উক্ত প্রবীণ শিক্ষাবিদ লেখকের হাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস সম্পর্কিত ১৯৭০ সালে Pakistan Historical Society কর্তৃক প্রকাশিত *A History of the Freedom Movement* গ্রন্থের চতুর্থ খন্ডের "Dacca University— Its Role in Freedom Movement" শীর্ষক দুষ্প্রাপ্য অংশবিশেষটি তুলে দেন। এই ঐতিহাসিক দলিলটি পড়ে যে কেউ যুগপৎ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হবেন এজন্য যে, বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতার মুখে অত্র এলাকার অনগ্রসর মুসলিম সমাজের উন্নয়নের জন্য ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজ 'আল্লাহ' -এর নাম ও 'মুসলিম' শব্দটি তুলে দেয়া হয়েছে! মুসলমান ধর্মের প্রতীক, দাড়ি -টুপিকে ব্যঙ্গ করে এখানে নাটক মঞ্চস্থ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে পবিত্র কুরআনের 'ইক্‌রা' অর্থাৎ'পড়' এবং পড়া-লেখার সাহায্যে জ্ঞান আহরণ সম্পর্কিত বিশ্বজনীন বাণীটি তুলে দিয়ে তদস্থলে আগ্রাসী বাবু সংস্কৃতির প্রতীক, 'মঙ্গল প্রদীপ' বসানো হয়েছে! এভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মাবরণে একদিকে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় চেতনায় আঘাত হানা

www.icsbook.info

হয়েছে এবং অপরদিকে, দেশে আগ্রাসী বিজাতীয় সংস্কৃতি চর্চার পথ প্রশস্ত করা হয়েছে।

পূর্ব বাংলার অনগ্রসর মুসলমানদের শিক্ষা ও উন্নয়নের জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনার বিরুদ্ধে হিন্দুরা কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল সে ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ইতিহাস সম্পর্কিত উল্লেখিত গ্রন্থের ১০নং পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছে ঃ "The controversy that started on the proposal for founding a university at Dacca, throws interesting light on the attitudes of the Hindus and Muslims. About two hundred prominent Hindus of East Bengal, headed by Babu Ananda Chandra Roy, the leading pleader of Dacca, submitted a memorial to the Viceroy vehemently against the establishment of a university at Dacca. For a long time afterwards, they tauntingly termed this university as 'Mecca University'. This attitude of opposition was expressed in an unmistakeable language by the Hindus of Dacca, who made a representation on behalf of the people of Dacca."[৩]

অর্থাৎ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে ঘিরে যে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে, তাতে এ বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মনোভাব সম্পর্কে একটি কৌতূহলজনক ধারণা পাওয়া যায়। ঢাকার উদীয়মান আইন ব্যবসায়ী বাবু আনন্দ চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার প্রায় দুই শত গণ্যমান্য হিন্দু, ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধিতা করে বৃটিশ ভাইসরয়ের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছিলেন। এর পরবর্তীতে দীর্ঘদিন ধরে তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়কে "মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়" হিসেবে পরিহাস করে। ঢাকায় হিন্দুদের এই বিরোধী মনোভঙ্গি সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পায় যারা 'ঢাকার জনগণের পক্ষ' হয়ে নিবেদন করেছিলেন। এছাড়াও হিন্দু সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বিভিন্ন শহরে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন এবং প্রস্তাব পাশ করে বৃটিশ সরকারের নিকট প্রেরন করেন।[৪] অপরদিকে, পূর্ব বাংলার অনগ্রসর

---

[৩]Pakistan Historical Society, *A History of the Freedom Movement*, Vol. IV: "Dacca University – Its Role in Freedom Movement." পৃঃ১০।

www.icsbook.info

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজের শিক্ষা ও উন্নয়নের জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন পরিচালনা করেন 'নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ্', 'সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী' এবং 'এ কে ফজলুল হক' প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ। এরা শুধু আন্দোলনই করেননি, নওয়াব সলিমুল্লাহ্ ও ঢাকার নওয়াব পরিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রাজবাড়ীর চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকাসহ বিস্তর জমি দান করেন যার উপর বিস্তৃত পরিসরে আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। অথচ এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ বা ছাত্র সংসদের উদ্যোগে প্রতি বছর যে জাঁক-জমকের সাথে বঙ্কিম-রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়, সেভাবে কখনও নওয়াব সলিমুল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয় না। অথচ এই রবীন্দ্রনাথই সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কলকাতার গড়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হিন্দুদের সভায় (২৮শে মার্চ, ১৯১২) সভাপতিত্ব করেছিলেন।[৫] উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রতিষ্ঠাতা 'মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র' নামে প্রতিষ্ঠিত ছাত্রাবাসের নাম পরিবর্তন করে 'সূর্যসেন' করা হয়েছে, কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 'সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী' যিনি নিজ জমিদারী বন্ধক রেখে সে যুগে (১৯২১ সালে) ৩৫ হাজার টাকা ভার্সিটি তহবিলে দান করেছিলেন, তাঁর নামে আজ অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হল বা ভবনের নামকরণ পর্যন্ত হয়নি।

এভাবে বাবু শ্রীশ চন্দ্র ব্যানার্জি, ডঃ (পরবর্তীতে স্যার) রাস বিহারী ঘোষ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জির নেতৃত্বে বাংলার হিন্দু এলিটগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ১৮ বার স্মারকলিপি সহকারে বাংলার তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ এর উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। ডঃ রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে হিন্দু প্রতিনিধিদল বড়লাটের কাছে এই বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ অধিকাংশই কৃষক, অতএব, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলে তাদের কোন উপকার হবে না (ঐ, পৃঃ ১৩৩)। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ১৯২১ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এর শুরুতে নিয়োগকৃত ৬০ জন শিক্ষকের মধ্যে হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন

[৪]বিস্তারিত আলোচনা জন্য দেখুন *ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি কমিশন রিপোর্ট*, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১২২-১৫১।

[৫]ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধিতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (১৭৫৭-১৯৪৭), ১৯৭৬, পৃঃ ১৩২-১৩৫।

www.icsbook.info

মুসলিম ছাড়া, বাকি প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু শিক্ষক। মুসলামানগণ ইসলামের উদার শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতাকারী হিন্দু শিক্ষকদের তিরস্কার করেনি, বরং তাদেরকে সাদরে ও সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

মূলতঃ 'পূর্ববঙ্গের মুসলিম জনগণের দীর্ঘ দিনের বঞ্চনা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের অনগ্রসরতা রোধকল্পেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে' (*অঙ্গন রিপোর্ট*, ১৯৮৮)। এ ব্যাপারে Calcutta University Commission এর বক্তব্য হচ্ছে ঃ "The creation of the University of Dacca was largely the result of the desire of the Muslims of East Bengal to stimulate the educational progress of their community and due to their demand for greater facilities of higher education"[৬] সেদিন যদি ঢাকার বুকে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত না হত, তাহলে পূর্ব বাংলার অনগ্রসর মুসলমানদের পরিণতি কি হত এ ব্যাপারে পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের ২৪ নং পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছেঃ

"If there had been no Dacca University, the Muslims of Bengal would have remained deprived of their share in the administration of the province and in all other departments of life in which English education was required for filling the posts," অর্থাৎ যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হত, তাহলে বাংলার মুসলমানগণ প্রাদেশিক প্রশাসনে তাদের অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকত এবং বঞ্চিত হত অন্যান্য সকল বিভাগ থেকে যেখানকার পদসমূহ পূরণের জন্য ইংরেজী শিক্ষা প্রয়োজনীয় ছিল। "Within twenty five years of the foundation of the University (1921-46), "উক্ত গ্রন্থে পুনরায় উল্লেখিত হয়েছে যে, "hundreds of qualified persons had filled posts in various departments of the Provincial Government. Dacca University produced journalists, judges, advocates and a number of public spirited men to fight the cause of their community. The subsequent history of the University shows that Dacca has been capable of training leaders for almost every walk of life," অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পঁচিশ বছরের মধ্যে

[৬] *Report of the Calcutta University Commission*, 1917-19. Part- II, Vol. IV, পৃঃ১২১।

www.icsbook.info

(১৯২১-৪৬), শত শত শিক্ষিত মুসলিম প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন বিভাগের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হলেন। নিজ সম্প্রদায়ের উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালনের জন্য ঢাকা (বিশ্ববিদ্যালয়) সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনবিদ এবং বহু তেজস্বী জননেতা তৈরী করল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী ইতিহাসে দেখা যায় যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্য নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষম হয়েছে।

অতএব, হিন্দু সম্প্রদায়ের দাবী অনুযায়ী যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত না হত, তাহলে অত্র অঞ্চলে একদল শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন মুসলিম এলিট বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠত না। চাষার সন্তানেরা চাষাই থেকে যেত। সেই একদল শিক্ষিত ও সচেতন মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল বলেই, তাঁদের আন্দোলনের ফলে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে আজকের বাংলাদেশ নামক রাজনৈতিক ভূখন্ডের ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল। সেদিন যদি ভারত বিভক্ত না হত, তাহলে এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের অবস্থা হত অনেকটা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মত। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে অবস্থিত ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে (যাদবপুর, কল্যাণী, রবীন্দ্র ভারতী, বিদ্যাসাগর, বর্ধমান, বিশ্বভারতী ও কলিকাতা) মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা মাত্র ৪ শতাংশ। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এই ৪০ বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা শতকরা এক ভাগও বাড়তে দেয়া হয়নি।[৭] অথচ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেশের মোট জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হিন্দু শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ২৬ শতাংশ অর্থাৎ নিজেদের নির্ধারিত কোটা পূরণ করার পরও তারা অতিরিক্ত ১৩ শতাংশ মুসলমান কোটা পূরণ করে আছে।[৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থটির সর্বশেষে এই আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, "The students of Dacca University

---

[৭]দেখুন 'পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা ঃ আজকাল-এর চোখে", *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ ও ২৭শে জুলাই, ১৯৮৬।

[৮]দেখুন "পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা কি?" *দৈনিক মিল্লাত*, ঢাকা, ১৩-১০-৯১ ইংরেজী।

www.icsbook.info

were... messengers of hope in the future of the Muslim community in Bangal", অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ভবিষ্যতে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আশা-ভরসার বার্তা বাহক (পৃঃ ২৫)। পরবর্তীকালের ঘটনাবলীতে এই আশাবাদের যথার্থতা বহুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এদেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পূনর্জাগরণে, ভাষা আন্দোলন, স্বাধীকার চেতনা ও স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভৃতি প্রতিটি যুগসন্ধিক্ষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা জাতীয় জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। ইতিহাস সাক্ষী, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় উন্নীত করেছে এবং উপমহাদেশে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতির আশা পূরণ তো নয়ই, বরং এখান থেকে 'মুসলিম', 'ইসলাম' ও 'আল্লাহ্'র নাম পর্যন্ত মুছে ফেলা হল! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিস্মৃত কতিপয় শিক্ষক ও ছাত্র আজ যা করছেন তার জন্য তাদেরকে জাতির সামনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো প্রয়োজন নয় কি?

ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু লক্ষ্যচ্যুতই হয়নি, প্রতিষ্ঠানটি একটি আদর্শিক শূন্যতায় ভুগছে। প্রশ্ন হচ্ছে, স্বাধীনতার পর তড়িঘড়ি করে কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম বদলানো হল? দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম বদলানোর কি সম্পর্ক? 'পড়া' সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের বাণী সম্বলিত মনোগ্রাম বদলানোর কারণ হিসাবে যুক্তি দেখান হল যে, "এটি পাকিস্তানী ধ্যান-ধারণা সমৃদ্ধ মনোগ্রাম। অতএব পরিবর্তন করতে হবে"।[৯] অদ্ভুত যুক্তি! পবিত্র কুরআনের ছবি ও এর বাণী যদি পাকিস্তানী ধ্যান-ধারণার প্রতীক বলে বিসর্জিত হয়, তাহলে এদেশের শতকরা ৮৭ ভাগ জনগোষ্ঠী যে কুরআনেরই অনুসারী! তাদেরকে কোথায় বিসর্জন দেয়া হবে? দ্বিতীয়তঃ কুরআনের আয়াত যদি পাকিস্তানী সংস্কৃতির প্রতীক হয়, তাহলে কুরআনের জায়গায় বাবু সমরজিত চৌধুরী অংকিত মঙ্গল প্রদীপটি কোন্ সংস্কৃতির প্রতীক?

---

[৯]মীর্জা তারেকুল কাদের, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে রদবদল,"*অংগন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস, '৮৮ এর বিশেষ প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৮৮ ইংরেজী।

www.icsbook.info

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে রদবদল

স্বাধীনতার পূর্বে স্বাধীনতার পরে

বিশ্বাস ও আচরণ

সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের আচরণের চালিকা শক্তি হচ্ছে তার দর্শন বা বিশ্বাস। অনুরূপভাবে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকর্মীর একটি বিশ্বদর্শন (দৃষ্টিভংগী, মূল্যবোধ ও প্রত্যাশা ইত্যাদি) থাকে যেটি প্রতিষ্ঠানে তার চিন্তা ও আচরণকে প্রভাবিত করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে জ্ঞান অর্জন সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতটি সার্বক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিত ইসলামের মহান শিক্ষা "উখরিয়াত লিন্‌ন্যাস" অর্থাৎ তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য (৩ঃ১১০); "ইন্নাল্লাহা য়্যা মুরুবিল আদ্‌লে ওয়াল ইহ্‌সানে" অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলীফা বা প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ করছেন সকল বিষয়ে 'ন্যায়বিচার' (আদল) করতে এবং 'মানুষের কল্যাণ' (ইহসান) সাধন করতে (১৬ঃ৯০); এবং পৃথিবীর সকল যুগের সকল দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য সেই বিশ্বজনীন দোয়া, "রাব্বি হাব্‌লি হিকমাতাও ওয়াআল হিক্‌নি বিস্‌ সোয়ালেহীন" অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে জ্ঞান দান কর এবং সৎকর্মপরায়নদের অন্তর্ভূক্ত কর (২৬ ঃ ৯৩)। এরই সাথে যুক্ত হয়েছে মহানবী (সঃ)– এর প্রার্থনা ঃ 'হে প্রভু! আমি তোমার কাছে কল্যাণ দানকারী জ্ঞান, পবিত্র জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল করার সাহায্য কামনা করছি" (*বায়নিল ইল্‌মে*, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬২)। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Preamble) যে মহান সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে, সেই মহান আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে, "লা তাবগিল ফাসাদা ফিল আরদে" অর্থাৎ পৃথিবীতে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি কর না (২৮ ঃ ৭৭), "ইন্নাল্লাহা লা য়ুহিব্বুল ফাসাদ" অর্থাৎ আল্লাহ্‌ অশান্তি সৃষ্টিকারীকে পছন্দ

www.icsbook.info

করেন না (২ ঃ ২৫); এবং "ওয়াল ফিত্‌নাতু আশাদ্দু মিলান কাতালি" অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা, দাংগা-কলহ ইত্যাদি হত্যা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর (২ ঃ ১১৯)। নিজেদের মধ্যে শক্তি প্রদর্শন বা অস্ত্রের মহড়া নয়, বরং আল্লাহ্ বলছেন, "ফাস্‌তাবিকুল খায়রাত" অর্থাৎ তোমরা সৎকর্মের প্রতিযোগিতা কর (২ ঃ ১৪৮)।

পারস্পরিক মর্যাদাবোধ ও আচরণে অন্যের প্রতি সহনশীল হবার ব্যাপারে কুরআনের শিক্ষা হচ্ছে, পরমত ও পরধর্মের প্রতি সহনশীল হও (২ ঃ ২৫৬, ৬ ঃ ১০৮, ১০৯ ঃ ৬); মাতা-পিতা ও শিক্ষক মুরব্বীসহ সমাজে সবার সাথে বিনয়ের সাথে আচরণ কর (২ঃ৮৩, ৩১ঃ১৯) এবং "উদ্‌ফা বিল্লাতি হিয়া আহসানুস্ সাইয়েয়াত" অর্থাৎ মন্দের মোকাবিলা কর উত্তম দ্বারা, তাহলে চরম শত্রুও পরিণত হবে পরম বন্ধুতে (২৩ঃ৯৬, ৪১ঃ৩৪)। সুশৃংখল আচরণ, পারস্পরিক নিরাপত্তা ও সম্প্রীতিমূলক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে ইসলামের নবী আরো নির্দেশ করেছেন ঃ "তুমি নিজের জন্য যা ভাল মনে করবে, অন্যের জন্যও তা ভাল মনে করবে এবং নিজের জন্য যেটি খারাপ মনে করবে, অন্যের জন্যও সেটিকে খারাপ মনে করবে" এবং "সেই সত্যিকার মুসলিম যার জিহ্বা ও হাত থেকে অপর মানুষ নিরাপদ থাকে।" চাঁদাবাজির দৌরাত্ম্য আর সন্ত্রাসমুখর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ সবচাইতে বেশী প্রয়োজন মানব জাতির জীবন দর্শন পবিত্র কুরআনের ও রসুল (সঃ) এর এ সকল মহান শিক্ষার আলোকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো। কেননা, ভাল আচরণের পূর্বশর্ত হচ্ছে মানসিকতার পরিবর্তন।

পবিত্র কুরআনের এ সকল শিক্ষাকে যারা সাম্প্রদায়িক বা প্রতিক্রিয়াশীল বলেন, অথবা পাকিস্তানী ধ্যান-ধারণার প্রতীক বলে বিসর্জন দিতে চান, বিগত বিশ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি কলঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে তারাই প্রমাণ করেছেন যে, আসলে তারাই জাতির কলংক, সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল। পবিত্র কুরআনের আয়াত সম্বলিত মনোগ্রাম থাকাকালীন সময়ে পরধর্মের প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আচরণে কখনও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়নি। কখনও ক্যাম্পাসে ধুতি পরিহিত এবং মাথায় টিক্‌লীধারী বাবুকে অপমান করা হয়নি, কোনদিন কপালে সিঁদুর লাগানো হিন্দু রমণীকে অপদস্থ করা হয়নি, আজকে যেভাবে ইসলামের নবী (সঃ) এর সুন্নাত পালনকারী শ্মশ্রুধারী মুসলিম যুবক বা বোরকা পরিহিত মুসলিম রমণীকে অপমান করা হচ্ছে!

www.icsbook.info

কলংক মুক্তির উপায় কি?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কলংকজনক পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? "প্রয়োজন একটি দুর্বার সংস্কার আন্দোলনের", কথাগুলি বলেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক তেজস্বী তরুণ শিক্ষক। এ ব্যাপারে প্রাথমিক করণীয় হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে সর্ব অমঙ্গলের প্রতীক জ্বলন্ত প্রদীপটিকে সরিয়ে তদ্‌স্থলে এর সংগ্রামী ইতিহাস, শিক্ষাকর্ম ও ঐতিহ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ চির কল্যাণকর ও বিশ্বজনীন পবিত্র কুরআনের বাণীটি পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে ন্যায় ও কল্যাণকামী এবং বিনয় ও সহনশীল আচরণে উদ্বুদ্ধকরণ। অনুরূপভাবে, জাতিকে বিভ্রান্তি, নৈরাজ্য ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন জাতীয় শিক্ষাক্রমকে একটি আদর্শিক লক্ষ্যের কাঠামোতে পুনর্বিন্যাস করা।

সাথে সাথে, শিক্ষকতার চাইতেও ছাত্রদেরকে সন্ত্রাসী তৎপরতায় উস্কানী প্রদানের জন্য অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণও প্রয়োজন। গরীব দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কষ্টার্জিত অর্থে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ যাতে জ্ঞান চর্চার মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে ক্যাম্পাসে নির্ধারিত আচরণবিধি মেনে চলেন, সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারের যৌথভাবে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য একটি প্রাথমিক করণীয় হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য এবং এর সংগ্রামী ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও দেশবাসীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

---

www.icsbook.info

"নির্মূল" বনাম "গণতন্ত্র"ঃ গণআদালতীদের ঐতিহাসিক বিপর্যয়

[অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই, গণপ্রত্যাখ্যাত শক্তিসমূহ 'নির্মূল কমিটি' ও 'গণ আদালত' গঠনের মাধ্যমে সন্ত্রাস ছড়াতে তৎপর হয়েছে সারা দেশে। নির্মূল তৎপরতা শুধু গণতন্ত্র ও সংবিধান পরিপন্থীই নয়, ফৌজদারী দন্ড বিধির ৩০৭, ৩২৬ ও ৩৪ ধারামতে দন্ডনীয় অপরাধ। এদের ফৌজদারী তৎপরতার শিকার হয়ে ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্নস্থানে প্রাণ হারিয়েছে ১২ জনেরও অধিক নাগরিক। নাগরিক জীবনে নিরাপত্তা বিঘ্নিতকারী এ জাতীয় মারমূখী কর্মোদ্যোগ ফ্যাসীজমের প্রতীক, বেশীদিন চলতে দিলে সরকারের প্রতি জনগণ হয়ে পড়বে আস্থাহীন, ফলে গণতন্ত্র হবে বিপদগ্রস্ত।

নির্মূল কমিটির উদ্যোক্তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য অধ্যাপক গোলাম আজম হলেও পর্যবেক্ষক মহলের মতে, এদের সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপের দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়েছে যে তাদের মুল টার্গেট হচ্ছে এদেশে ইসলামী নবজাগরণের চেতনাকে প্রতিহত করা। আজ থেকে এক হাজার তিন শত একাত্তর বৎসর পূর্বে, ইসলামের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়েছিল আবু জেহেল ও তার স্ত্রী হিন্দার নেতৃত্বে গঠিত নির্মূল কমিটির ঐতিহাসিক 'দারুণ নদ্ওয়ার' বৈঠকে। পরবর্তীকালে সংঘটিত বদরের যুদ্ধে নিহত সত্তর জন ইসলামের শত্রুদের মধ্য থেকে রসুল (সঃ) এর নির্দেশে ২৪টি লাশকে পৃথক করে একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এই ২৪ জন ছিল মুহাম্মদ (সঃ) এর বিরুদ্ধে

www.icsbook.info

ঐতিহাসিক 'দারুণ নদ্ওয়ার' গণআদালতে অংশগ্রহনকারী নির্মূল উদ্যোক্তা]

'গণতন্ত্র' বনাম 'নির্মূল'ঃ

'গণতন্ত্রের' সর্বোৎকৃষ্ট মূল্যবোধ হচ্ছে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য। এই পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় সমাজে বসবাসকারী সকল মানুষের জন্য কতগুলি মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে। এগুলির মধ্যে রয়েছে চিন্তার স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সম মতাবলম্বীদের সাথে সংগঠিত হবার স্বাধীনতা এবং সভা-সমিতি করার স্বাধীনতা ইত্যাদি। অপরদিকে, 'নির্মূল' হচ্ছে একটি মারমুখী কর্মোদ্যোগ। এতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কোন স্থান নেই। বরং দলীয় বা গোষ্ঠীর ইচ্ছার কাছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য হয় ভূলুণ্ঠিত। এটি একটি স্বৈরাচারী মূল্যবোধ, ফ্যাসীজমের প্রতীক। এর অবলম্বন হচ্ছে জোরের যুক্তি, গণতন্ত্রের ন্যায় যুক্তির জোর নয়। অতএব, 'গণতন্ত্র' ও 'নির্মূল'- দু'টি পরস্পর বিরোধী ধারা। আর পরস্পরের পরিপন্থী বলেই একে-অপরকে করতে পারে বাধাগ্রস্ত।

'নির্মূল' কমিটি ও 'গণতান্ত্রিক' সরকার ঃ

বাংলাদেশের ইতিহাসে অনুষ্ঠিত নজিরবিহীন এক অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ নির্বাচিত সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর পরই, "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি" বলে আত্মপরিচয়দানকারী এক শ্রেণীর নগরবাসী বিশ বৎসর পূর্বে মীমাংসিত কিছু ইস্যুকে অবলম্বন করে "ঘাতক ও দালাল নির্মূল কমিটি" নামে একটি সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে দেশব্যাপী এক ব্যাপক সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। ক্ষমতাসীন বি, এন, পি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকারের মতোঃ "ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি গঠনের মাধ্যমে নতুন করে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে সারা দেশে"।[১] একই কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নজমুল হুদার বক্তব্যে। বিগত ১৩ই নভেম্বর (১৯৯২) ঢাকা জেলা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সম্মেলনে বক্তৃতাদানকালে তিনি বলেন ঃ "মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে যেসব দল মাঠে নেমেছে, তাদের মতলব ভাল নয়। তারা নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা

[১] বিগত ১২ই আগষ্ট ১৯৯২ ইংরেজী বি,এন,পি সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের উপর জাতীয় সংসদে আলোচনাকালে।

www.icsbook.info

ও সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করতে চায়।" একই সম্মেলনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের আহ্বায়ক, যোগাযোগমন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমেদ বলেন ঃ "ঘাতক কমিটির অনেকেই সেদিন বিদেশী প্রভুর সাথে ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকেও হত্যা করেছিলেন।"

বিগত ২৬শে মার্চ (১৯৯২) থেকে শুরু করে, এদের সন্ত্রাসী তৎপরতার শিকার হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে এক ডজনেরও অধিক ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছে বলে পত্র–পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বিকারিত্বের (Indifference) সুযোগে, নির্মূল কমিটির গণতন্ত্র বিরোধী ফৌজদারী তৎপরতায় নির্মূল হয়েছে স্বাধীন দেশের ১২ জনেরও অধিক নাগরিক। এভাবে ঘাতক নির্মূলের নামে নিজেরাই ঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে 'ঘাতক ও দালাল নির্মূল' সংক্ষেপে, *'ঘাদানি'* কমিটির উদ্যোক্তারা একই অপরাধে অপরাধী হয়ে পড়েছেন।

বাংলাদেশ ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩০৭, ৩২৬ ও ৩৪ ধারামতে, 'নির্মূল' তৎপরতা দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু রহস্যজনক কারণে বি,এন,পি সরকার এ জাতীয় সংবিধান পরিপন্থী তৎপরতায় গণতান্ত্রিক ছাড়পত্র দিলেও ১২জন আইন মান্যকারী নিরীহ নাগরিকের বেঁচে থাকার সংবিধান স্বীকৃত অধিকার সংরক্ষণে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে! এক পর্যায়ে নির্মূল কমিটির সম্মুখ সমরে নিয়োজিত ২৪জন গণআদালতীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনের লংঘন ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ আনীত হলেও সার্বভৌম সংসদকে অবজ্ঞা করে "মাঝরাতের সমঝোতা" নামক কলংকিত চুক্তির মাধ্যমে সরকারী দল উক্ত মামলা প্রত্যাহারে অংগীকারাবদ্ধ হয়েছে! এতে শুধু সরকারের দুর্বলতাই প্রতিফলিত হয়নি, গণতন্ত্রকে করা হয়েছে অনিশ্চিত। পর্যবেক্ষক মহলের মতে, 'মাঝরাতের সমঝোতা' চুক্তির মাধ্যমে 'নির্মূল কমিটির' সকল ধরণের অগণতান্ত্রিক ও সন্ত্রাসী তৎপরতাকে বাধাহীন করার 'তোহ্ফা' হিসাবে, বি,এন,পি তথা জনগণ নির্বাচিত সরকার সম্প্রতি নির্মূল কমিটির উদ্যোক্তাদের সহায়ক রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা সংসদে আনীত এক অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হয়েছিল। সংসদে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বি, এন, পি সরকার অনাস্থা উদ্যোগের প্রাথমিক ধাক্কা সামলিয়ে নিলেও, 'নির্মূল কমিটির" উদ্যোক্তারা নির্বাচিত সরকারের পদত্যাগের দাবীতে এক ব্যাপক ও বহুমূখী আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।

www.icsbook.info

যুব কমান্ডের আবির্ভাব ঃ

অবশ্য 'নির্মূল কমিটির' ফৌজদারী তৎপরতা বন্ধের ব্যাপারে গণতান্ত্রিক সরকার অজ্ঞাত কারণে নির্বিকার ভূমিকা পালন করলেও এদেরকে প্রতিহত করার জন্য ইতোমধ্যে জনগনের পক্ষ থেকে "যুব কমান্ড" নামে একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে। এদের নির্মূল প্রতিরোধী তৎপরতা 'নির্মূল কমিটির' উদ্যোক্তাদের মধ্যে বেশ কিছুটা ভীতির সঞ্চার করেছে বলে মনে হয়। 'যুব কমান্ডের' ভয়ে ইদানিং রাস্তা-ঘাটে গণআদালতীদের আনাগোনা সীমিত হয়ে পড়লেও, এক শ্রেণীর সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় অবশ্য সংবাদপত্রের একাধিক কলামজুড়ে তাদের আস্ফালন অব্যাহত রয়েছে।

নির্মূল কমিটির লক্ষ্য ঃ

'নির্মূল' কমিটির উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য অধ্যাপক গোলাম আজমকে নির্মূল করা হলেও পর্যবেক্ষক মহলের মতে, এদের সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপের (যেমন-*দৈনিক ইনকিলাব, মিল্লাত* ও *সংগ্রাম* অফিসে হামলা, *ইসলামী ব্যাংক* ও *আলবারাকা ব্যাংকে* ভাংচুর, বায়তুল মোকার্‌রমের খতিবকে অপমান এবং মসজিদে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী ইত্যাদি) দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের মূল টার্গেট হচ্ছে এদেশে ইসলামী নবজাগরণের চেতনাকে প্রতিহত করা । প্রাথমিকভাবে তারা বিগত ২৬শে মার্চ (১৯৯২) 'গণআদালত' গঠন করে যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছিলেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা যাবে না বা তার বিচার করা যাবে না এমন কথা এদেশে কেউ কখনও বলেনি, এখনও বলছেনা। এ ব্যাপারে কোন ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্সও নেই। গণতান্ত্রিক সমাজে সরকার থেকে শুরু করে যে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। এবং সেই অভিযোগ তদন্ত ও প্রমাণিত হওয়া সাপেক্ষে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংবিধান স্বীকৃত আইন ও বিচার ব্যবস্থা রয়েছে। এজন্য 'গণতন্ত্রকে' বলা হয় আইনের শাসন। এটি হচ্ছে গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু *'ঘাদানি কমিটির'* উদ্যোক্তারা সংবিধান স্বীকৃত দেশের প্রচলিত আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করে নিজেরাই 'গণআদলত' গঠন করে তাদের বিবেচনায় অধ্যাপক গোলাম আযমকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডের রায় ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ এভাবে তাঁরা সংবিধান,

www.icsbook.info

প্রচলিত আইন ও বিচার ব্যবস্থা, মোটকথা পুরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন।

অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে 'নির্মূল কমিটি' আনীত প্রাথমিক অভিযোগটি যুদ্ধ অপরাধ সংক্রান্ত হলেও তাঁর প্রধান অপরাধ হচ্ছে তিনি রাজনীতির অপবিত্র অংগণে পবিত্র ধর্ম আমদানীতে প্রয়াসী হয়েছেন, অর্থাৎ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে দীর্ঘ রাজনৈতিক ব্যর্থতা, ব্যাপক প্রশাসনিক দুর্নীতি ও সামাজিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে, "আল্লাহ্‌র আইন ও সৎলোকের শাসন" কায়েমের দাবীতে দেশে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন।[২]

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নির্মূল তৎপরতা ঃ

আজ থেকে এক হাজার তিন শত একাত্তর বৎসর পূর্বে, আরবের বুকে দাঁড়িয়ে 'সকল মানুষ সমান, এক আল্লাহ্‌র সৃষ্টি'। অতএব, সৃষ্টিকর্তা "একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া (মানুষের উপর) আর কারো প্রভুত্ব নেই" –এ কথাগুলি উচ্চারণ করে একটি সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন ইসলামের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। একারণে তাঁকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়েছিল আবু জেহেল ও তার স্ত্রী হিন্দার নেতৃত্বে গঠিত নির্মূল কমিটির ঐতিহাসিক "দারুণ নদ্‌ওয়ার" বৈঠকে।[৩] কুরাইশ দলনেতা আবু জেহেলের পরিকল্পনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয় যে, মক্কার প্রতিটি উপজাতি থেকে একজন করে শক্তিমান যুবক তাদের ধারালো তরবারীর সাহায্যে একযোগে নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর শরীরে আঘাত হানবে, যাতে প্রত্যেকের গায়ে রক্তের চিহ্ন লাগে।[৪]

মুহাম্মদ (সঃ) এমন কি অপরাধ করেছিলেন যে তাঁকে নির্মূল করা এতই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল? বিশিষ্ট ইউরোপীয় চিন্তাবিদ মুহাম্মদ আসাদের (ধর্মান্তরিত অষ্ট্রিয়ান ইহুদী লিওপোর্ড উইস) মতে, মুহাম্মদের (সঃ) প্রধান অপরাধ ছিল যে তিনি "রাজনীতিতে ধর্ম আমদানী অর্থাৎ সামাজিক

---

[২]অধ্যাপক গোলাম আযম, *আল্লাহ্‌র আইন ও সৎ লোকের শাসন*, ১৯৯২।

[৩]M. H. Haykal, *The Life of Muhammed*, North American Trust Publication, 1976, পৃঃ ১৬২।

[৪] ঐ

www.icsbook.info

পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ্‌র উপলব্ধিকে আরম্ভ বিন্দু করে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন।[৫] কুরাইশদের কাছে যখন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে "মুহাম্মদ (সঃ) কোন একজন স্বপ্নচারী নন, বরং তিনি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারেন কর্মের উদ্দীপনা, তখন প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার রক্ষকেরা জবরদস্ত পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করলো এবং তাঁকে এবং তাঁর সহচরগণকে নিপীড়ণ শুরু করে দিল"।[৬]

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে শেষ পর্যন্ত নিজ পিতৃভূমি ছেড়ে মদিনায় হিজরত করতে হয়েছে ইংরেজী ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে। এতে তিনি নির্মূল উদ্যোক্তাদের হত্যা প্রচেষ্টা থেকে সাময়িকভাবে রেহাই পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু কুরাইশদের তৎপরতা দমে যায়নি। মুহাম্মদ (সঃ) এর অনুসারীদের উপর তাদের অত্যাচার-নিপীড়ণের মাত্রা পূর্বের তুলনায় আরো বেড়ে যায়। তারা মক্কা নগরীর বিভিন্ন স্থানে কবিদের আসর বসিয়ে মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর প্রচারিত ধর্ম-দর্শনের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করতে থাকে।

গণআদালতীদের ঐতিহাসিক বিপর্যয় ঃ

মদীনায় হিযরতের প্রথম বর্ষেই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর প্রণীত ঐতিহাসিক "মদীনা সনদের" মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি সাংবিধানিক সরকার গঠন ও "ইসলামী রাষ্ট্রের" গোড়াপত্তন করেন।[৭]

সাথে সাথে, ঈমানী চেতনায় বলীয়ান এক দুর্ধর্ষ প্রতিরোধ বাহিনীও গড়ে তুলতে সক্ষম হন। কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর ইসলামী শক্তিকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে নির্মূল করে দেবার সর্বাত্মক অংগীকার নিয়ে, আবু জেহেলের নেতৃত্বে মক্কার কোরাইশ বাহিনী ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ 'বদর' নামক স্থানে মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে লিপ্ত হয় এক মরণপণ ধ্বংসযজ্ঞে। মক্কার 'নির্মূল কমিটির' উদ্যোগে সংগঠিত এই ঐতিহাসিক বিপর্যয়মূলক যুদ্ধে নিহত হয় অর্ধ শতাধিক ইসলামের দুশমন।[৮]

---

[৫] মুহাম্মদ আসাদ, *মক্কার পথে*, অধ্যাপক শাহেদ আলী অনূদিত, ১৯৮৭, পৃঃ ৪১২।

[৬] ঐ

[৭] Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Cambridge University Press, 1979, পৃঃ-275।

[৮] *The Cambridge History of Islam*, Vol.1A, 1970, পৃঃ 45।

www.icsbook.info

এদের মধ্যে ২৪ জন ছিলেন মুহাম্মদ (সঃ) এর বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক "দারুণ নদ্ওয়া" নামক গণআদালতে অংশগ্রহণকারী নির্মূল উদ্যোক্তা।

এর পরের কাহিনী আরো চিত্তাকর্ষক। 'নির্মূল কমিটির' নির্মূল হয়ে যাওয়া দলনেতা আবু জেহেল সহ ২৪ জন কুরাইশ নেতার লাশকে মুহাম্মদ (সঃ) এর নির্দেশে একটি পৃথক কংকরময় কূপে নিক্ষেপ করা হল। অতঃপর নির্মূল উদ্যোক্তাদের স্তুপীকৃত লাশ সমূহের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে রসূল (সঃ) বললেন ঃ "হালওয়াজাদতুম মা' ওয়াদাকুম রাব্বুকুম হাক্কান। ইন্না ক্বাদ্ ওয়াজাদ্ না মা' ওয়াদানা রাব্বুনা হাক্কান" অর্থাৎ "তোমরা কি তোমাদের সাথে কৃত তোমাদের প্রভুর ওয়াদা সঠিকভাবে পেয়েছ? আল্লাহ্ আমাদের সাথে যে অংগীকার করেছিলেন আমরা পুরাপুরিই তা সঠিকভাবে পেয়েছি"।[৯]

এভাবে ইতিহাসের পাতায় একটি নির্মূল কমিটির নির্মূল হয়ে যাওয়ার হৃদয় বিদারক কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। অপরদিকে, এই ঘটনার মাত্র দশ বৎসরেরও কম সময়ের ভিতর নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর নেতৃত্বে ইসলামের বিজয় পতাকা তিনটি মহাদেশের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে উড্ডীয়মান হয় । কিন্তু বিজ্ঞজনেরা বলেন, ইতিহাসের বড় শিক্ষা হচ্ছে, "আদাল্লুরা" (কুরআনের পরিভাষা যার অর্থ হচ্ছে, উদ্‌ভ্রান্ত, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট) কখনও ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

---

[৯] *সহীহ্ আল-বুখারী,* নং ৩৬৮৪, বাংলা সংস্করণ, ৪র্থ খন্ড, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২, পৃঃ ৩২।

www.icsbook.info

www.icsbook.info

পরিশিষ্ট—ক

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার আম্রকাননে প্রবাসী বাংলাদেশ (মুজিবনগর) সরকার কর্তৃক ঘোষিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র ...

PROCLAMATION OF INDEPENDENCE ORDER, DATED APRIL 10, 1971 : TEXT OF PROCLAMATION:

Press report on April 18, 1971

Mujeeb Nagar (Bangla Desh)

The proclamation of independence order, which was issued on April 10 shall be deemed to have come into effect from March 26, 1971. The text is as follows :—

"The proclamation of independence order, dated 10th day of April 1971".

"Whereas free elections were held in Bangla Desh from 7th December, 1970 to 17th January 1971, to elect representatives for the purpose of framing a Constitution, and "whereas at these elections the people of Bangla Desh elected 167 out of 169 representatives belonging to the Awami League, and whereas Gen. Yahya Khan summoned the elected representatives of the people to meet on the 3rd March, 1971, for the purpose of framing a constitution, and "whereas the Assembly so summoned was arbitrarily and illegally postponed for indefinite period, and "whereas instead of fulfilling their promise and while still conferring with the representatives of people of Bangla Desh, Pakistan authorities declared an unjust and treacherous war, and

Genocide

"Whereas in the facts and circumstances of such treacherous conduct Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of 75 millions of people of Bangla Desh, in due fulfilment of the legitimate right of self-determination of the people of Bangla Desh,

duly made declaration of independence at Dacca on March 26, 1971, and integrity of Bangla Desh, and whereas in the conduct of a ruthless and savage war the Pakistani authorities committed and are still committing numerous acts of genocide and unprecedented tortures, amongst others on the civilian and unarmed people of Bangla Desh, and "whereas the Pakistan Government by levying an unjust war and committing genocide and by other repressive measures made it impossible for the elected representatives of the people of Bangla Desh to meet and frame a Constitution, and give to themselves a government and "whereas the people of Bangla Desh by their heroism, bravery and revolutionary fervour have established effective control over the territories of Bangla Desh, "we the elected representatives of the people of Bangla Desh, as honour bound by the mandate given to us by the people of Bangla Desh whose will is supreme duly constituted ourselves into a Constituent Assembly, and having held mutual consultations, and in order to ensure for the people of Bangla Desh equality, human dignity and social justice, "declare and constitute Bangla Desh to be sovereign people's Republic and thereby confirm the declaration of independence already made by Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman, and

www.icsbook.info

President

"Do hereby confirm and resolve that till such time as a constitution is framed, Bangla Bandhu Sheikh Mujibur Rahman shall be the President of the Republic and that Syed Nazrul Islam shall be the Vice-President of the Republic and that the President, shall be the Supreme commander of all the armed forces of the Republic, shall exercise all the executive and legislative powers of the Republic including the power to grant pardon, shall have the power to appoint a Prime Minister and such other Ministers as he considers necessary, shall have the power to levy taxes and expend monies shall have the power to summon and adjourn the constituent Assembly, and do all other things that may be necessary to give to the people of Bangla Desh an orderly and just government.

We the elected representatives of the people of Bangla Desh do further resolve that in the event of there being no President or the President being unable to enter upon his office or being unable to exercise his powers and duties due to any reason whatsoever, the Vice-President shall have and exercise all the powers, duties and responsibilities herein conferred on the President, we further resolve that we undertake to observe and give effect to all duties and obligations devolved upon us as a member of the family of nations and by the Charter of the United Nations, we further resolve that this proclamation of independence shall be deemed to have come into effect since 26th day of March, 1971.

"We further resolve that to give effect to this our resolution, we authorise and appoint Prof. M. Yusuf Ali, our duly constituted potentiary to give to the President and Vice-President oaths of office".

(THE SUNDAY STANDARD—April 18, 1971.)

Source: Government of India, Ministry of Exter Affairs, Bangladesh Documents, Vol. 1, New Delhi, 197 pp. 281-282.

www.icsbook.info

পরিশিষ্ট—খ

সত্তর এর নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ সংসদীয় কমিটি কর্তৃক পাকিস্তানের জন্য প্রণীত খসড়া শাসনতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ বিশেষ...

Heading	Source	Date
Highlights of the drafted Constitution of Pakistan framed by the Awami League Parliamentary Committee	Dr. Kamal Hossain	..1970

DRAFT CONSTITUTION OF THE FEDERAL REPUBLIC OF PAKISTAN

PREAMBLE

In the name of Allah, the Beneficient, the Merciful, we, the peoples of the autonomous States of Bangla Desh, the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan,

Having by our common struggle against colonial rule attained the right of self determination,

In order to secure for ourselves and for our posterity the right to live in freedom and with dignity and to establish a real, living democracy, wherein equality and justice, political, economic and social, would prevail,

Having had to struggle, since independence, against successive usurpers of the power, which rightfully belonged to the people,

Having now attained victory, as a result of the heroic sacrifices of the martyers who laid down their lives in order to end exploitation of man by man, and region by region,

Resolving that the high ideals for which they laid down their lives shall be fundamental principles of the Constitution,

Further resolving that guarantees shall be embodied in this Constitution to enable the peoples of Pakistan, Muslims, Hindus, Buddhists, Christians, Persians and of other religions to profess and practise their religion and to enjoy all rights,

www.icsbook.info

privileges and protection due to them as citizens of Pakistan, and in pursuance of this object *to enable the Muslims of Pakistan, individually and collectively to order their lives in accordance with the teachings of Islam as set out in the Holy Quoran and the Sunnah,*

Affirming that the Constitution shall effectively guarantee supremancy of civil power, exercised through elected representatives of the people over the armed forces and all military authorities;

Solemnly pledging that it is our sacred duty to abide by and to safeguard, protect and defend this Constitution and to maintain its supremacy, as the embodiment of the will of the people and the basis, freely determined by them, for living together in a Federal State and striving together so that we may prosper and obtain our rightful place amongst the nations of the world and make our full contribution towards international peace and the progress and happiness of humanity.

THIS ASSEMBLY, this the day of..... One thousand nine-hundred and seventy-one, corresponding to the day of..... 1391 A. H. and the .....day

1377 B.S., WE DO HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

PART 1-THE FEDERAL REPUBLIC AND ITS TERRITORIES

The Republic and its territories

1(1). Pakistan shall be a Federal Republic under the name Federal Republic of Pakistan, and shall be composed of the autonomous States of Bangla Desh, Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan, and such other territories as may become included in Pakistan, whether by accession or otherwise.

(2). The territories of each of the states as are included in Pakistan are specified in the First Schedule.

www.icsbook.info

Alteration of territories of States

2. No Bill Providing for altering the limits of a State or increasing or diminishing the area of any State shall be introduced in the Federal Parliament, unless it has earlier been approved by the Assembly of the State concerned by the votes of not less than two-thirds of the total members of that Assembly.

* * * *

PART 111-DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY

1. ISLAM

(1) No law shall be repugnant to the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quoran and Sunnah.

(2) Facilities shall be provided for the teaching of the Holy Quoran and Islamiat to the Muslims of Pakistan.

(3) Observance of Islamic moral standards should be promoted amongst the Muslims of Pakistan.

11. RIGHTS OF MEMBERS OF OTHER RELIGIOUS DENOMINATONS

Members of all other religious denominations shall enjoy full rights of citizenship and in addition to the constitutional protection of their fundamental rights, their legitimate rights and interests shall be duly safeguarded in all spheres.

111. ESTABLISHMENT OF A SOCIALIST ECONOMIC SYSTEM WITH A VIEW TO ACHIEVING A SOCIETY FREE FROM EXPLOITATION.

With a view to achieving a just and egalitarian society, free from exploitation of man by man, and of region by region, a socialist economic system shall be established.

www.icsbook.info

IV. STATE'S RESPONSIBLITY TO ENSURE BASIC NECESSITIES OF LIFE, EMPLOYMENT, IMPROVEMENT IN THE STANDARD OF LIVING, AND SOCIAL SECURITY.

It shall be a fundamental responsibility of the State to ensure, through planned economic growths development:

(i) the provision to all citizens of the basic necessities of life, including food, clothing,shelter, education and medical care;

(ii) the right to work, that is, the right to guaranteed employment at a reasonable wage, having regard to the quantity and quality of work;

(iii) the right to reasonable rest, recreation and leisure;

(iv) the steady and sustained improvement in the standard of living, material and cultural, of the people;

(v) the provision of social security, through *inter alia*, the extensive development of compulsory social insurance of industrial, office and professional workers;

(vi) the right to maintenance in old age.

V. RIGHTS OF WORKERS AND PEASANTS

It shall be a fundamental responsibility of the State to safeguard and promote the rights and interest of workers and peasants.

www.icsbook.info

(VI) EMANCIPATION OF THE RURAL MASSES FROM EXPLOITATION AND IMPROVEMENT IN THEIR QUALITY OF LIFE.

The rural masses shall be emancipated from exploitation by, among other measures, the total abolition of the Jagirdari, Zamindari and Sardari systems and the re-orientation of the land system in the interests of the actual tillers of land....

* * * *

Source: Hasan Hafizure Rahman (ed.), *History of Bangladesh War of Independence: Documents* , Vol. 1 (Dhaka: Ministry of Information, Government of the People's Republic of Bangladesh, 1982), pp. 793-808.

www.icsbook.info

"পাকিস্তান সৃষ্টির পর জন প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্টার আন্দোলন আর স্বাতন্ত্র্য অর্জনের প্রেরণা একাকার হয়ে গিয়েছিল আর সৃষ্টি করেছিল এক সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম যার চূড়ান্ত পরিণতি ন' মাসের মুক্তিযুদ্ধ। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি একটি মাত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে, সে লক্ষ্য হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। পিন্ডির শোষন ও শাসনের শৃংখল আমরা ছিন্ন করার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম। কিন্তু এমনও অনেকে ছিলেন যারা পিন্ডির পরিবর্তে দেশকে দিল্লী-মস্কো কিংবা অন্য কোন ভিন্ন দেশের হাতে তুলে দেয়ার জন্য লিপ্ত ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা দাবিদার এই অংশের প্রচেষ্টা জনতার স্বাধীনতার চেতনার প্রতি চরম অবমাননা। তাদের কারো কারো সে চেষ্টা আজও অব্যাহত রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের সামনে ছিল একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ, যার রাষ্ট্রীয় জীবনে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির ধর্মীয় বিশ্বাস ও কৃষ্টি প্রতিফলিত হবে। কোন বিজাতীয় মূল্যবোধের অনুপ্রবেশ নয়। কিন্তু ভিন্ন দেশের ক্রীড়নক শক্তি বিজাতীয় ধ্যান-ধারনার অনুপ্রবেশ ঘটাবার জন্য আজও তৎপর।"

-প্রবাসী বাংলাদেশ (মুজিবনগর) সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
খন্দকার মোস্তাক আহ্‌মদ।

www.icsbook.info

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই

- স্বাধীনতার ঘোষণা ও বাংলাদেশ, ১৯৯০
- **Social Justice in Bangladesh, 1991**
- ঘুম অপেক্ষা প্রার্থণা শ্রেয় ঃ একটি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, ১৯৮৮
- বিশ্ব পরিস্থিতি, মানব জীবন ও ধর্ম, ১৯৮৭
- রোজা ও নামাজ ঃ তাৎপর্য বিশ্লেষণ, ১৯৮৭
- টেন্‌শন ঃ কারণ, প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকার, ১৯৮৮

লেখকের প্রকাশিতব্য বই

- লোক প্রশাসন, আমলাতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার
- **Social Justice Through Public Administration: An Islamic Perspective**
- **Local Government Finance in Bangladesh**
- ইসলাম ও উন্নয়ন ঃ পাশ্চাত্য সমালোচনার জবাবে

www.icsbook.info

www.icsbook.info

লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক আবদুন নূর ১৯৫০ সালে চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৬ সালে কাপ্তাই প্রজেক্ট হাই স্কুল থেকে এস, এস, সি; ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে এইচ, এস, সি এবং ১৯৭১ ও ৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও লোক প্রশাসনে বি, এ, অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। লেখক কলেজ জীবন থেকেই ছাত্রলীগের রাজনীতি বিশেষতঃ বাংলাদেশের স্বাধীকার আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে তিনি উনসত্তরের গণ আন্দোলন এবং একাত্তরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর চরম ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে লেখক নবগঠিত জাসদ (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং ১৯৭৩ সালে জাসদ সমর্থিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সূর্যসেন হলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। একই বৎসর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব গঠিত লোক প্রশাসন বিভাগীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতিও নির্বাচিত হন।

কর্ম জীবনে লেখক বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (১৯৭৫-৭৭) এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে (১৯৭৭-১৯৮০) প্রভাষকের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি এ/ডি/সি (নিউইয়র্ক) ফেলো হিসাবে ইউনিভার্সিটি মালয়া এবং বৃটিশ কাউন্সিল ফেলো হিসাবে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। জনাব নূর বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন। তিনি দেশী ও বিদেশী জার্নাল, সাময়িকী ইত্যাদির একজন নিয়মিত লেখক। ইতিমধ্যে তাঁর রচিত স্বাধীনতার ঘোষণা ও বাংলাদেশ, (১৯৯০) এবং Social Justice in Bangladesh, 1991 শীর্ষক দু'খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যা সুধিমহলের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।